# অগ্নি-বীণার শতবর্ষে নজরুল-সমালোচনার সংক্ষিপ্ত রূপালেখ্য

সৌভিক রেজা

সাহিত্য পত্রিকা
Shahitto Potrika
eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 1-2
February 2023

সাহিত্য পত্রিকা: ফাল্গুন ১৪২৯ (২০২৩)
বর্ষ: ৫৮ সংখ্যা: ১-২ পৃষ্ঠা: ১-২৩

DOI 10.62328/sp.v58i1-2.1

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৮ ॥ সংখ্যা : ১-২ ॥ ফাল্গুন ১৪২৯ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

# অগ্নি-বীণার শতবর্ষে নজরুল-সমালোচনার সংক্ষিপ্ত রূপালেখ্য

সৌভিক রেজা*

**সারসংক্ষেপ:** বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুলকেই আমরা বলতে পারি একজন প্রতিভাবান কবি। শুধুই যে প্রতিভাবান তা নয়, একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন মৌলিক কবি। নজরুলের *অগ্নি-বীণা* কাব্য প্রকাশের পরপরই তাঁকে একজন যুগ-প্রবর্তক কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই কাব্যে নজরুল, তাঁর যুগটিকে, তাঁর সমকালকে বিচিত্রভাবে বুঝে নেয়া আর তাকে শৈল্পিক প্রকাশে চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। নজরুলের কাব্য-অভিযানের অগ্রযাত্রার শুরুটা সেখান থেকেই। এসবের পাশাপাশি আমাদের সাহিত্যে দেখা যায় নজরুলের কাব্য-সমালোচনার একটি নতুন ধারা। নতুন কাব্যরীতির প্রবর্তক ছিলেন বলেই, আমাদের সাহিত্যে, সমালোচকদের একটা বড় অংশ নজরুলের কৃতিত্বের জায়গাটি সুনির্দিষ্টভাবে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। অর্থাৎ নজরুলের কবিতাই শুধু নয়, নজরুলের কাব্যের সমালোচনাগুলো আমাদের সাহিত্যে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। বাংলা সাহিত্যে নজরুল-সমালোচনার সে-ধারা এবং তার নিহিত পালা-বদল এক অর্থে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনারও পালা-বদল বটে। নজরুলের *অগ্নি-বীণা* প্রকাশের শতবর্ষে এসে তাঁর কবিতা আলোচনার পাশাপাশি সাহিত্য-সমালোচনার সে-ধরনটিও আমরা এখানে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করেছি।

## প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত কবি

কবি জীবনানন্দ দাশ বিশ্বাস করতেন যে, 'একজন কবিকে... তাঁর প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত থাকতে হবে; হয়তো কোনও একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতাবৃত্ত প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয়ে মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের খেতে বুননের জন্যে।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ২৩-২৪) আবার সেইসঙ্গে তিনি এটিও বলতে ভোলেননি যে, 'মানুষের শিল্প-সাধনার... বহুমুখিনতার বৈচিত্র্যকে... আমাদের স্বীকার করতে হবে।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ১২৪-১২৫) আমাদের সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে একটা বড় ত্রুটি এই যে কথাগুলোকে আমরা বেশিরভাগ সময়ই ভুলে থাকি। সে-কারণেই আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য খুব বড়-একটা পরিধি জুড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এটি কারো একার নয়, আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতার হাত থেকে নজরুল ইসলামের মতো কবিকেও আমরা রেহাই দিতে পারিনি।

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

## নজরুল ও তাঁর কাব্যপ্রতিভা

কবি-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ জানিয়েছিলেন, '১৯২২ সালে প্রথম নজরুল গ্রন্থকার হিশেবে আবির্ভূত হন, আবার ওই বছরেই তাঁর গ্রন্থ প্রথমবারের মতন বাজেয়াপ্ত হয় – যার স্বাদ উত্তরকালে তিনি পাবেন আরো বারবার।' অন্যদিকে, ওই "১৯২২ সালে প্রথমবারের মতন নজরুল-সম্পাদিত একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, 'ধূমকেতু', আবার ওই বছরেই তাঁরই 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্যে পত্রিকাটিও বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, তাঁকে পালিয়ে থাকতে হয় এবং বছর শেষে ধরা পড়েন, মামলা রুজু হয়, পরবর্তী বছরের শুরুতে ১-বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।" (আবদুল মান্নান, ২০১৬: ৬)

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অগ্নি-বীণা* প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৯২২ সালে (কার্তিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষকে।' (কাজী নজরুল, ২০১২: ৪৩৭) *অগ্নি-বীণা*কে সামনে রেখেই কবি নজরুল ইসলামকে নিয়ে সাহিত্য-সমালোচনার একটা বড় অংশ আবর্তিত হয়েছে। এটি নজরুলের এমন একটি গ্রন্থ, যা কিনা যুবক বয়সের প্রথম পর্যায়ের রচনা হলেও পরবর্তী সময়ের সমস্ত কাব্যপ্রয়াসকে যেন ছাপিয়ে গিয়েছে। যে-কারণে নজরুলের কাব্য-প্রতিভা আর *অগ্নি-বীণা* সমার্থক বলা হলেও খুব বেশি বাড়িয়ে বলা যেমন হয় না, তেমনই আবার এর মধ্য দিয়ে নজরুলের পরবর্তী জীবনের কাব্যচর্চাকে নাকচ করবার একটা সূক্ষ্ম আশঙ্কাও কিন্তু রয়ে যায়। আমরা বাড়িয়েও যেমন কিছু বলতে চাই না, এর পাশাপাশি কোনোকিছুকে নাকচ করবার কূটবুদ্ধি থেকেও যোজন-যোজন দূরে সরে থাকতে চাই। তাহলে আমরা এ প্রবন্ধে কী উপস্থাপন করতে চাইছি? তেমন কিছুই না। *অগ্নি-বীণা*কে সামনে রেখে নজরুল-সমালোচনার একটা রূপরেখা মোটা দাগে পাঠকের সামনে হাজির করতে চেয়েছি।

## নজরুল-সাহিত্যের পটভূমি

নজরুল যে-সময়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝে নেয়াটা বেশ জরুরি। শুধু নজরুলের বেলায়ই নয়, সাহিত্যের যে-কোনো ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেই এটা অত্যাবশ্যক বলে আমরা ধারণা করি। এর কারণটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুশীলকুমার দে বলেছিলেন, 'Every history of literature should always have a back-ground of political and social history.' (Sushil,1962: 5)

নজরুলের সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছিলেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট অর্থ উপার্জনের একমাত্র অবাধ ক্ষেত্র ছিল হাইকোর্ট অথবা জেলা কোর্টে ওকালতি।... দিন দিন... সে ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল।... এমন কি বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে খাস বাঙ্গালারও খানিকটা টুকরা বাহির করিয়া লইয়া

বাঙ্গালা দেশকেই ছোট করিয়া ফেলা হইল। বাঙ্গালীর ঘরের হাতায় যেন প্রাচীর উঠিল।' (সুকুমার, ২০১০: ২৭২) তিনি এ-প্রসঙ্গে আরো জানিয়েছেন, 'মিন্টো-মর্লি রিফর্মের দৌলতে (১৯১০) শাসন ও বিচার বিভাগীয় উচ্চতম চাকরিতে নিতান্ত দুই-চারজন যোগ্য উচ্চশিক্ষিতেরই স্থান হইতে লাগিল। ওকালতি ও শিক্ষকতার দিকে আকর্ষণ না থাকায় এই দুই ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব দেখা দিল। বাঙ্গালীর জেদ যখন জয়ী হইল, বঙ্গভঙ্গ রদ হইল, শাসন-কর্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন ইহাতে বাঙ্গালী শান্ত হইবে। তাহা হইল না, পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবপ্রচেষ্টার অবসান ঘটাইতে পারিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সে প্রচেষ্টায় বাহিরে-চাপা আগুন নিভিল না, ধূম ছাড়িতে লাগিল। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মের (১৯১৯) সান্ত্বনা কার্যকর হইল না। গান্ধীজি নন্‌-কোঅপারেশনের শঙ্খধ্বনি করিলেন, দেশের সর্বত্র হইতে সাড়া জাগিল। প্রমাণ হইয়া গেল যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দেশের মধ্যে দ্বিমত নাই।' (সুকুমার, ২০১০: ২৭২)

নজরুল-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির আলোচনায় এ প্রেক্ষাপট জানাটা জরুরি। কেননা বিংশ শতাব্দীর শুরুর সময়টা নজরুলের সাহিত্যে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর নজরুল নিজেও সেই সময়পর্বকে তাঁর সাহিত্যে, বিশেষ করে কবিতায়, নানাভাবে চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কবি সি. ডে লুইস বিশ্বাস করতেন যে, 'Most poets are stimulated by the ideas of their age, and all must respond to the climate of their times. (Lewis, 1957: 27) আজকের দিনেও এ কথাটির তাৎপর্য ও বাস্তবতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

## কতটা হাবিলদার কতটা কবি

কবি নজরুলের সাহিত্যকর্মের সমালোচনার প্রাথমিক যুগে সমালোচনাগুলোতে দেখব, তৎকালীন পত্রিকাগুলোর সংশ্লিষ্ট সম্পাদক এবং লেখক কোনোপক্ষই ভুলতে পারছেন না যে, তিনি একসময় সৈনিকের চাকরি নিয়ে বাংলার বাইরে গিয়েছিলেন। একটা উদাহরণ দিই – *বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* (ভাদ্র, ১৩২৬) নজরুল-সম্পর্কে লেখা হয়েছে, 'শ্রীকাজী নজরুল ইসলাম বঙ্গ বাহিনীর একজন হাবিলদার। ইনি করাচীর সেনানিবাসের কর্ম-কোলাহলের মধ্যেও মাতৃভাষাকে স্মরণ করিয়াছেন, মাতৃভাষার অনুশীলন করিতেছেন।' সেখানে আরো বলা হয়েছিল, নজরুল "রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্পগুলি পড়িয়াছেন, এবং তাঁহার অনুসরণে 'মুক্তি' লিখিয়াছেন। বাঙ্গালী সৈনিক-শিবিরে যে ভাষার সাধনা করিতেছেন, সে ভাষার আশা করিব না? – অনুকরণ সম্পূর্ণ হইলেও অনুকরণ। এ অনুকরণ সর্বাংশে সফল হইয়াছে, এমন কথাও বলিতে পারি না। কিন্তু একজন নব-ব্রতী মুসলমান রবীন্দ্রনাথের ছন্দের ও ভাষার এতটা সন্নিহিত হইয়াছেন, ইহাও অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।' (মুস্তাফা, ২০১৫: ২৯)

এ-কথা ঠিক যে, নজরুলের প্রথম এবং যথাযথ শৈল্পিক সমালোচনা আমরা পেয়েছি, কবি-সমালোচক-অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদারের কাছ থেকে। শুধু সত্যের খাতিরে নয়; তথ্যের খাতিরে এবং নজরুলের কাব্যকর্মকে বুঝে নিতে পারার স্বার্থেও এ তথ্যটি আমাদের স্বীকার করা উচিত। *মোসলেম ভারত*-সম্পাদককে লিখিত পত্রে (ভাদ্র ১৩২৭) মোহিতলাল বলেছিলেন, 'আমার অনেকদিন হইতে একটি ক্ষোভ ছিল এই যে, বাঙ্গালী হইয়া মাতৃ ভাষার প্রতি উদাসীন থাকায়, মুসলমানগণ আমাদের সর্বাপেক্ষা গৌরবের ধন সাহিত্য ও ভাষাকে তাহার পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছেন না, এবং নিজেরাও তাঁহাদের হৃদয়নিহিত মনুষ্যত্বের স্বধর্ম ও স্বকীয় সাধনার বিশিষ্ট সৌন্দর্যের অবাধ স্ফূর্তির অভাবে প্রাণে-মনে পঙ্গু হইয়া রহিলেন।' (মোহিতলাল, ১৯৬৯: ১) অবশ্য নজরুল যে একজন 'মুসলমান কবি' সেটি মোহিতলাল মজুমদার কখনোই ভুলতে পারেননি, ওই চিঠিতেও নয়। এমনকি নজরুল যে হাবিলদার ছিলেন, সেটিও মোহিতলাল পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। তবে তাঁর প্রেক্ষণবিন্দু ছিল নজরুলের কবিতার শিল্প-সৌকর্যের দিকেই। সে-কারণেই বলেছিলেন, 'মুসলমান লেখকের সমস্ত রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিলেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গালা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে... তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁহার ভাষা ও ছন্দ।' (মোহিতলাল, ১৯৬৯: ২) বাংলা ভাষা যে কবি নজরুলের প্রাণের ভাষা, সেটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই মোহিতলাল মজুমদার জানিয়েছিলেন, 'আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গালার সারস্বত-মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যমোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক-সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি।' (মোহিতলাল, ১৯৬৯: ২) একজন সমালোচকের কর্তব্য বিষয়ে মোহিতলাল কতটা সচেতন ছিলেন, এ চিঠির মধ্য দিয়েই সেটির একটি বিশিষ্ট নমুনা আমরা দেখি। নজরুলের কবিতা কেন তাঁকে এ 'সুখের কর্তব্য সম্পাদনে' প্ররোচিত করেছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোহিতলাল জানিয়েছিলেন, 'কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গালা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে।... কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃ-উৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী।' (মোহিতলাল, ১৯৬৯: ৩) তিনি শুধু এখানেই থামেননি, আপন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিষয়ে রক্ষণশীল অবস্থানে থেকেও মোহিতলাল মজুমদার সমালোচনা সাহিত্যে যে-উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটি বুঝতে পারা যায়, যখন দেখি উদাহরণ হিসেবে তিনি নজরুলের 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতাটিকেই বেছে নেন। মোহিতলালের মতে, "খেয়া-পারের তরণী' শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি

করিয়াছে; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে – কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই – এই প্রকৃত কবি-শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে।'

মোহিতলাল তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে কবিতাটি থেকে উদাহরণ দিতেও কার্পণ্য করেননি। তিনি বলেছেন, "কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগতভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি ভীষণ গম্ভীর অতি-প্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দ-ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব –

আবুবকর উসমান উমর আলী-হাইদর (য)
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারিগান – 'লা শরীক আল্লাহ্!"

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে; বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য – 'লা শরীক আল্লাহ্' – যেমন মিল তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য-যোজনা বাঙ্গালা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে!' (মোহিতলাল, ১৯৬৯: ৪)

বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান সমালোচক ও কবি হিসেবে মোহিতলাল মজুমদার বিশ্বাস করতেন যে, 'কাব্যের মধ্যে কবির যে সহৃদয়তার পরিচয় পাই, যে সহানুভূতিকে সত্য-কার কবি-ধর্ম বলিয়া বুঝি, তাহা লৌকিক হৃদয়াবৃত্তি নয়।' (মোহিতলাল, ২০০৬: ১০) সে-কারণেই 'কবিধর্ম' বলতে তিনি কবিত্বকেই বুঝিয়েছিলেন, যা সরাসরি একজন কবির সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। নজরুলের কাব্যে মোহিতলাল মজুমদার সেই সৃষ্টিশক্তিরই তাৎপর্যময় প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। সে-কারণেই মোহিতলাল মজুমদারের এ চিঠিতে 'নবীন কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিপ্রতিভার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আছে।' সেইসঙ্গে এটিও মনে রাখলে সুবিধা হয় যে, 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতাটি নজরুলের *অগ্নি-বীণা* কাব্যেরই অন্তর্ভূত। সে-কারণে এ সমালোচনাটিকে যদি অংশত সেই কাব্যেরই একটি সমালোচনা হিসেবে ধরা হয়, তাহলেও কোনোভাবেই সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘিত হয় না, সমালোচনার পরিধিকেও অগ্রাহ্য করা হয় না।

## প্রতিভাবান কবি আবার প্রতিভাবান বালক

মোহিতলালের পরে নজরুল-সমালোচনায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা। এ সমালোচনাকে কেন্দ্র করেও এর পক্ষে-বিপক্ষে নানা ধরনের অভিমত গড়ে উঠেছে আমাদের সাহিত্যে। বুদ্ধদেব তাঁর সম্পাদিত *কবিতা* পত্রিকায় যে-অল্প কয়েকজন কবিকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যার আয়োজন করেছিলেন, তাঁদেরই একজন নজরুল ইসলাম। কবিতার নজরুল সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ: ১৩৫১) যখন প্রকাশিত হয়েছে, নজরুল তখন অসুস্থ। তারপরও বলা দরকার যে, এ সংখ্যাটি আমাদের সাহিত্যের জগতে নতুন করে পাঠকের সামনে নজরুলকে তুলে ধরেছিল। বুদ্ধদেব বসু ছাড়াও এ সংখ্যায় আরো যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – জীবনানন্দ দাশ ('নজরুলের কবিতা'), লীলাময় রায় ('নজরুল ইসলাম'), শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ('নজরুল'), সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ('আমাদের নজরুল') প্রমুখ।

তাঁর 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধের শুরুতেই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "কৃচিৎ এমন ঘটনাও দেশে ঘটে, যার ধাক্কায় স্তিমিততম মফস্বলও থরথর করে কেঁপে জেগে ওঠে। গান্ধিজির প্রথম অসহযোগ আন্দোলন তেমনি একটি ঘটনা।... ঠিক এই উন্মাদনারই সুর নিয়ে এই সময় নজরুল ইসলামের কবিতা প্রথম আমার কাছে এলো। 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে – মনে হলো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগে অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তা-ই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।" (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৪৫) শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতাটিই নয়, বুদ্ধদেব বসু তাঁর আলোচনায় নজরুলের 'প্রলয়োল্লাস', 'কামাল পাশা', 'কোরবানি' কবিতাটির সূত্র ধরেই নিজের স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে, 'নোয়াখালির রাক্ষসী নদীর আগাছা-কণ্টকিত কর্দমাক্ত নদীতীরে বসে (কলকাতা-ফেরত এক মুসলমান যুবকের কাছে পাওয়া বাঁধানো খাতা) সেই খাতাখানা আদ্যোপান্ত পড়ে ফেললুম।... সে-সব কবিতা অচিরেই ছাপার অক্ষরে দেখা যেতে লাগলো, তাদের দুরন্ত অভিনবত্ব আমাদের প্রশংসা করবার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলে।' নিজের আবেগ-যুক্তি আর ভাষার মাধুর্য দিয়ে সমালোচনার এ রীতি যে একান্তভাবেই বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব, সেটি বুঝতে বেগ পেতে হয় না। বুদ্ধদেব বসু আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে জানিয়েছিলেন, 'তাঁর (নজরুল) নিখাদ-নির্ঘোষ আমাদের মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলে ফিরতে লাগলো:

তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।

নূতনের কেতন সত্যি উড়লো। নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হলেন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে অন্য-কোনো কবি বিখ্যাত বিখ্যাত হননি।' (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৪৫-৪৬) মোহিতলাল মজুমদারের বেলায় আমরা যে-বিষয়টি বলেছিলাম,

সেটিও বুদ্ধদেবের বেলায় দেখতে পাই – ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে তিনি নজরুলের যেসব কবিতার উল্লেখ আর উদ্ধৃতি করেছেন, তার বেশিরভাগই দেখবো *অগ্নি-বীণা* কাব্যের, যা কিনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯ বঙ্গাব্দে!

নজরুলের কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নজরুলের কবি-ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করতেও বুদ্ধদেব বসু কোনোরকম দ্বিধা করেননি। তিনি বলেছিলেন, 'বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড়ো কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামের। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন তখন সত্যেন্দ্র দত্ত তাঁর খ্যাতির চরম চূড়ায় অধিষ্ঠিত, তাঁর প্রভাব সে-সময়টায় বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।' (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৪৯) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে নজরুলের পার্থক্য তুলে ধরতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, 'নজরুলের রচনায় সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিলো না তা নয় – কেনই বা না থাকবে – কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি তাঁর স্বকীয়তা সুস্পষ্ট এবং প্রবলভাবে ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলাদেশ তাঁকে গ্রহণ করলে, স্বীকার করলে – তাঁর বই রাজ-রোষ এবং প্রজানুরাগ লাভ করে এডিশনের পর এডিশন কাটতে লাগলো – অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করলেন তিনি। এটা কবির পক্ষে বিরল ভাগ্যের কথা।' (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৪৯) নজরুলের এ ভাগ্যটা যে ঠিক কপাল গুণে কুড়িয়ে পাওয়া নয়, সে-বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বেশ স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন, 'নজরুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলবার কথা এইটেই যে তিনি একইসঙ্গে লোকপ্রিয় কবি এবং ভালো কবি – তার পরে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, এ-সমন্বয় দুর্লভ, কারণ সাধারণত দেখা যায় যে বাজে লেখাই সঙ্গে-সঙ্গে সর্বসাধারণের হাত তালি পায়, ভালো লেখার ভালোত্ব উপলব্ধি করতে সময় লাগে।' (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৪৯)

কাব্যরচনায় নজরুলের কৃতিত্ব ঠিক কোথায়, সেটি দেখাতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ – এবং প্রধান দোষ। পড়েই বোঝা যায় যে যা-কিছু তিনি লিখেছেন, হু-হু করে লিখেছেন; ভাবতে বুঝতে মাজা-ঘষা করতে করতে কখনো থামেননি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি।' আবার এরইসঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন, 'এই ক্ষমতা চমকপ্রদ কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। এ-দিক থেকে বায়রনের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য ধরা পড়ে – সেই কাঁচা, কড়া, উদ্দাম-শক্তি, সেই চিন্তাহীন অনর্গলতা, কাব্যের কলকব্জার উপর সেই সহজ নিশ্চিত দখল, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, আতিশয্য, শৈথিল্য, সেই রসের ক্ষীণতা, রূপের হীনতা, রুচির স্খলন। গ্যোয়টে বায়রন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও সে-কথা সত্য: 'The moment he thinks, he is a child.' (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৫০) একেরমানকে (Johann Peter *Eckermann*: 1792-1854) দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিশ্বকবি গ্যোয়েটে (Johann Wolfgang von Goethe: 1749-1832) আদতে কী বলেছিলেন? কবি বায়রন সম্পর্কে গ্যোয়েটে বলেছিলেন, 'He is a great talent, a born talent, and I

never saw the true poetical greater in any man.' (*Eckermann,1951: 89)* বুদ্ধদেব যেটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটিও গ্যোয়েটে বলেছিলেন। কিন্তু তার পরের বাক্যগুলো কিন্তু বুদ্ধদেব আর উল্লেখ করেননি। যদি করতেন, তাহলে গ্যোয়েটের কথাটির পূর্ণাঙ্গ চেহারা আমরা দেখতে পেতাম, বুঝতে পারতাম। গ্যোয়েটে বলেছিলেন, 'Lord Byron only great as a poet; as soon as he reflects, he is a child.' কেন শিশু বলেছিলেন? তার কারণ হচ্ছে, বায়রন সম্পর্কে গ্যোয়েটে মনে করতেন, 'He knows not how to help himself against stupid attacks of the same kind made upon him by his own countrymen.' (*Eckermann, 1951: 82)* অথচ আমরা দেখি যে গ্যোয়েটের মিথ্যে দোহাই পেড়ে বুদ্ধদেব কিনা বায়রনের মতো নজরুলকেও 'প্রতিভাবান বালকের' সঙ্গে মিথ্যেমিথ্যি তুলনা করে গেলেন। (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৫০) আবারো এ-ও তো ঠিক যে, সেই একই প্রবন্ধের উপসংহারে এসে সেই বুদ্ধদেবই বলেছিলেন, "বিদ্রোহী' কবি, 'সাম্যবাদী' কবি কিংবা 'সর্বহারা'র কবি হিসেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানিনে, কিন্তু কালের কণ্ঠে গানের মালা তিনি পরিয়ে দিয়েছেন, সে-মালা ছোটো কিন্তু অক্ষয়। আর কবিতাতেও তাঁর আসন নিঃসংশয়, কেননা কবিতায় তাঁর আছে শক্তি, আছে স্বাচ্ছন্দ্য, আছে সচ্ছলতা, আর এগুলিই কবিতার আদিগুণ।" (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৫২)

**নজরুলের কবিতা এক টুকরো সবুজ জমি**

শুধুই প্রবন্ধেই নয়, *কবিতা*র নজরুল সংখ্যার সম্পাদকীয়তে (কার্তিক-পৌষ: ১৩৫১) বুদ্ধদেব খানিকটা আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, 'আজকাল যে-সব রচনা রাজনৈতিক কবিতা বলে আমাদের কাছে ধরা হয়, তার ধূসর নীরবতার সঙ্গে নজরুলের উদ্দীপ্ত আনন্দের প্রতিতুলনা সহজেই মনে জাগে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরে একজনকেও দেখলাম না রাজনীতির প্রেরণা থেকে একটি কবিতা লিখতে।' আর এরই সূত্রে তিনি জানিয়েছিলেন, 'আজকাল যে-সাম্যের বাণী লোকের মুখে-মুখে বুলিতে পরিণত হয়েছে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলই তাঁর প্রথম উদ্গাতা। রাজনীতিকে তিনি এড়িয়ে চলেননি, তার মধ্যে নিজেকে হারিয়েও ফেলেননি – তা থেকে বের করেছেন সুর-ঝংকার, এবং সেটাই তো কবির কাজ।' আর সেই কারণেই নজরুলের প্রতি বুদ্ধদেবের যত অনুরাগ, সেটি প্রকাশ করতেও তিনি কোনোরকমের দ্বিধা করেননি। তাঁর মতে, "এখনকার রাজনৈতিক আড্ডায় শুধু এইজন্যই তাঁর সম্মান হতে পারতো, সেটা হয়নি এই কারণে যে প্রগতিশীল পরিভাষায় নজরুলের কবিতা 'রোমান্টিক'।" বলা যায়, অনেকটা সরাসরি নজরুলের পক্ষ নিয়ে সমালোচক বুদ্ধদেব বসু প্রচণ্ড রকমের আত্মবিশ্বাস নিয়ে সেদিন বলেছিলেন, "বিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা – এ-সমস্ত জিনিসকে যাঁরা 'রোমান্টিক' বলে একপাশে সরিয়ে রাখেন, তাঁদের পক্ষে সাহিত্যচর্চা নিতান্তই অবৈধ।" (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৭৪)

*কবিতা*র নজরুল সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধে যা কিছু বলেছিলেন, তার প্রায় সবই তিনি অনুবৃত্তি করলেন *An Acre of Green Grass* গ্রন্থে। সেখানেও তিনি বললেন, 'The

seed of satyendranath datta became active in Nazrul Islam, who, like him, performed the unusual feat of being nothing but a writer of verse and at the same time widely read.' বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'The reason for this popularity, in the case of the first, are topicality, lilting measures and a comfortable explictness that makes no demand on the reader's mental faculties.' আর সেই কথার সূত্র ধরেই তিনি আগের মতানুসারেই বলেছিলেন, 'Nazrul Islam has all these, and something more: an orator-like loudness which contrasts exquisitely with the sinuous whisperings of Jibanananda. These qualities, with different sets of modifications, re-appear in Premendra Mitra and, after an interval of about twenty years, in Subhas Mukhopadhyay.' (Buddhadeva, 1982: 59)

পরবর্তী সময়ে, ১৯৫২ সালে রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'তাঁর (নজরুল) রচনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই।' এ প্রসঙ্গ টেনে বুদ্ধদেব আরো বলেছিলেন, 'নজরুলের কবিতাও অসংযত, অসংবৃত, প্রগল্‌ভ; তাতে পরিণতির দিকে প্রবণতা নেই।' আবার এতকিছুর পরেও বুদ্ধদেব বসু সহজ ভাষায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন, 'নজরুলের দোষগুলি সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমস্ত দোষ ছাপিয়ে ওঠে; সব সত্ত্বেও এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি।' (বুদ্ধদেব, ১৩৬১: ১৪৫)

## নজরুল কেন বড় কবি: এক

বুদ্ধদেব বসুর পরে আমরা যে-মেধাবী সমালোচকের কাছ থেকে ধারাবাহিকভাবে অখণ্ড নজরুলের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা পেয়েছি, তিনি হলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। এতটা বিস্তৃত পরিসরে আর কেউই নজরুলের সাহিত্যিক-কৃতিত্বের রহস্য উন্মোচনে সেইভাবে এগিয়ে আসেননি।

মান্নান সৈয়দের সমালোচনার একটা বড় অংশকে আমরা বলতে পারি প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। যথাযথভাবে বলা হলে এটিকে বলা যায়, পূর্ববর্তী সমালোচকদের বক্তব্যের একটি প্রত্যুত্তর। যেমন মান্নান সৈয়দ যখন বলেন, 'বিবর্তনহীন? পরিণতিরিক্ত? প্রতিভাবান বালক? নজরুল-প্রাসঙ্গিক এইসব উক্তির একটি কারণ নজরুল-সমকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনঘোর উপস্থিতি। নানারকম চেতনাপ্রসারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের বিস্তর সাযুজ্য থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। নজরুলকে সর্বাংশে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ ও সমান্তরাল মনে করলে ভুল করব আমরা; কিন্তু ও-রকম তুলনামূলকতার এ-রকম বদভ্যাস তৈরি করেছি আমরা, যে, হয় নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিশেবে দাঁড় করাতে চেষ্টা করি, অথবা তাঁকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিই। কিন্তু রবীন্দ্রোচিত বিবর্তন – বাংলা কাব্যেতিহাসে – আর কই?' (আবদুল মান্নান, মার্চ ২০১৬: ৩৫) আমাদের তখন বুঝতে দেরি হয় না যে, নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু যে 'প্রতিভাবান বালকের' কথা বলেছিলেন,

এটি তারই প্রতিক্রিয়ায় রচিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ আরো বলেছিলেন, 'একা নজরুল কেন; মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ – যাঁরা রবীন্দ্রবিধর্মী কবি, তাঁদের কারো মধ্যেই কি বর্তমান? এমনকি উত্তরকালীন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কি জীবনভর খুব-বেশি বিবর্তিত হয়েছেন?' (আবদুল মান্নান, ২০১৬: ৩৫) এরই বিস্তারে গিয়ে নিজের কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মান্নান সৈয়দ এ-ও জানিয়েছিলেন, 'বস্তুত রবীন্দ্রসমকালে বা অব্যবহিত পরে কবিশিল্পীদের এ-ই ছিল প্রায় বিধিলিপি: তাঁদের চাষ করতে হয়েছে আলাদা ছোট খেতে; রবীন্দ্রোত্তর ক্রমাগত ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তর ভ্রমণ ভ্রমণ তাঁদের পক্ষে ছিল অসম্ভব – তাঁদের ব্যক্তিপ্রতিভার কারণে যেমন, তেম্নি সেই বিশেষ সময়ের চাপেও। যে-ছোট খেতটিতে তাঁরা চাষবাস করেছিলেন, সেখানে তাঁরা সফল।' (আবদুল মান্নান, ২০১৬: ৩৫) তারপরই আবদুল মান্নান সৈয়দ যৌক্তিকভাবেই প্রশ্ন রেখেছেন, 'একা নজরুলের উপর সব অপরাধ অর্শানো হয় কেন? এর একমাত্র জবাব কি এই হতে পারে, যে, শক্তিতে ও সম্ভাবনায় তিনি আর সবাইকে অতিক্রম করে যান – মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-কে?' (আবদুল মান্নান, ২০১৬: ৩৫) সাহিত্যের একটি চিরন্তন সমস্যাকে সামনে টেনে এনে মান্নান সৈয়দ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বলেছেন, 'সাহিত্যে এরকম বিচার বা সমাধান অত্যন্ত কঠিন বটে, হয়তো অপ্রয়োজনীয়-ও; তবু অজস্র স্খলন-পতন-ত্রুটি সত্ত্বেও, সম্ভবত, এঁদের মধ্যে প্রতিভাশক্তিতে নজরুলই সর্বাধিক অপরিমেয়: এ-রকম উক্তিতে লুব্ধ হই আমরা।' (আবদুল মান্নান, ২০১৬: ৩৫)

## নজরুল কেন বড় কবি: দুই

নিজের কথাগুলোর একটা শৈল্পিক ভিত্তি দেবার সক্রিয়তা থেকেই আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন, 'পরিণতির অপর দিকটিও প্রসঙ্গত বিবেচ্য। বলা হয়ে থাকে যে নজরুলের কবিতার মধ্যে অন্তর্গত পরিণতি দুর্লভ। এই কথাটিও খুব সতর্কভাবে বিচার্য। নজরুল যে-ধরনের কবি, তাতে, তাঁর পক্ষে তথাকথিত নিটোলতা-নিবিড়তাই কি প্রয়োজনীয়?' সেইসঙ্গে তিনি এই প্রয়োজনীয় কথাটিও বলতে ভোলেননি যে, 'প্রত্যেকটি শিল্পকাজের আলাদা ও নিজস্ব একটি মানদণ্ড আছে শিল্পের সামান্য শর্তাদির পরে: এই তথ্যটি তো বিস্মৃত হওয়া অনুচিত।' কেননা, মান্নান সৈয়দের মতে, "এরই অভাবে এ-রকম মন্তব্য আমাদের শুনতে হয়, যে, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সংক্ষিপ্ততর হতে পারত, অথবা এরকম ঢালাও বক্তব্য, যে, নজরুলের শিল্পশাসন অবর্তমান।" এখানেই থামেননি মান্নান সৈয়দ। তিনি তাঁর বক্তব্যের জের টেনে বলেছিলেন, 'যে-কোনো মানুষের মতন লেখকও কোনো সরল জীব নন। কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে প্রথমেই এক কুৎসা উৎসাদন করা উচিত যে তিনি একজন সরল লেখক ও কবি।' (আবদুল মান্নান, ২০১৬: ৩৫) মান্নান সৈয়দের মতে, 'নজরুল ইসলাম একজন জটিল ও আত্মবৈপরীত্যময় লেখকশিল্পী। মাত্র

২৪-বছরের (১৯১৯-১৯৪২) সাহিত্যসাধনায় তিনি যে-বিপুল ও বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর স্তব্ধতার ৬০-বছর পরেও আমাদের দুই বাংলার একাডেমি-ইনস্টিটিউট-ব্যক্তিগত উদ্যোগ তা নিঃশেষে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর মধ্যে কবির সুস্থাবস্থায় অন্ততপক্ষে তাঁর ৫০টি বই বেরিয়েছে এবং তার মধ্যে আছে কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, গান, গীতিনাট্য, কাব্যানুবাদ,স্বরলিপি, কিশোরসাহিত্য, পাঠ্য বই, প্রবন্ধ, সমালোচনা, অভিভাষণ ইত্যাদি।' (আবদুল মান্নান, জুন ২০১৬: ৩) মান্নান সৈয়দ তাঁর বক্তব্যের উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, 'স্তব্ধতা থেকে মৃত্যুকাল অবধি অন্ততপক্ষে তাঁর ৩০টি বই বেরিয়েছে।... সব মিলিয়ে এই ৮০-র অধিক বইয়ে এবং এখনো-অগ্রন্থিত আরো অনেক লেখায় যে-নজরুল ইসলামকে আমরা পাই তিনি বলিষ্ঠ বটে, নির্দ্বিধ বটে, কিন্তু সমস্ত-মিলিয়ে তাঁকে কিছুতেই সরল বলা চলে না, বলতে বাধ্য হই কূটাভাসময়।' (আবদুল মান্নান, জুন ২০১৬: ৩)

## নজরুল কেন বড় কবি: তিন

নজরুলের রচনাকর্ম বিষয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দের বিশ্লেষণ হচ্ছে, '১৯১৯ সালে নজরুল ইসলাম সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি চিরদিনের মতন নির্বাক হয়ে ও অসুস্থ হয়ে যান। সুতরাং ১৯১৯-৪২ এই ২৪ বছর নজরুলের শিল্পসাধনার কাল।' তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, 'এই ২৪ বছরের মধ্যে একটি বছরকে – ১৯২২ সালকে – আমরা মনে করি নজরুলের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছর। শুধু নজরুল-সাহিত্যের নয় – সমগ্র বাংলা সাহিত্যের জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ।' (আবদুল মান্নান, জুন ২০১৬: ৫) কেন গুরুত্বপূর্ণ? – তার কারণ দেখাতে গিয়ে মান্নান সৈয়দ একজন সাবালক সমালোচকের যাবতীয় দক্ষতা নিয়ে বলেছিলেন, "১৯২২ সালে নজরুল গ্রন্থকার হিশেবে আবির্ভূত হন – গল্পকার হিশেবে 'ব্যথার দান', কবি হিশেবে 'অগ্নি-বীণা' আর প্রবন্ধকার হিশেবে 'যুগবাণী'। এই ১৯২২ সালেই নজরুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা, বিংশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা, আবহমান বাংলা কবিতার একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা, 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয় – এবং নজরুলের নামের সঙ্গে চিরকালের মতন 'বিদ্রোহী কবি' কথাটি যুক্ত হয়ে যায়।" (আবদুল মান্নান, জুন ২০১৬: ৫) আমাদের সমালোচকদের মধ্যে কেউই, মান্নান সৈয়দের পূর্বে, এমন করে আবেগ-উত্তাপের শিল্পিত নিবিড়তা নিয়ে, ভাবনার সৌকর্যকে গুরুত্ব দিয়ে এভাবে নজরুলের রচনাকর্মের বিশ্লেষণ করেননি।

## শতবর্ষের *অগ্নি-বীণা* আমার

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা, যা কিনা *অগ্নি-বীণা* কাব্যের অন্তর্ভুক্ত, সেই কবিতা সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, "৮০-বছর আগে রচিত হলেও নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা আজো সমান জ্বলজ্বলে। ব্যক্তির উচ্চতার আকাঙ্ক্ষায় কবিতার শুরু আর শেষ

সমষ্টি ভাবনা-বেদনায়।" (আবদুল মান্নান, জুন ২০১৬: ৬) এ কবিতা সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দ আরো জানিয়েছিলেন, "বিদ্রোহী' যেমন নজরুলের খ্যাতিতম কবিতা, তেমনি বাংলা কাব্যেতিহাসের এক প্রোজ্জ্বল প্রাসাদ। এই কবিতার বিচারে এর রচনা ও প্রকাশের ইতিহাস, এর লোকপ্রিয়তা ও বিরুদ্ধতা, এর প্রকৃত মূল্যায়নের নানামুখী চেষ্টা, নজরুলের কবিতার অণুবিশ্ব রূপে এর অবস্থান, বাংলা কবিতার ইতিহাসে এর অভিনবত্ব – এই সমস্ত দিকই আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে।' সেইসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছিলেন, 'বেদনার সঙ্গে মনে রাখতে হবে: এই কবিতার পাণ্ডুলিপি, খুব সম্ভবত লুপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে – পাওয়া গেলে বিংশ শতাব্দীর একটি প্রধান কবিতার সৃষ্টিপদ্ধতির খানিকটা আঁচ পাওয়া যেতো।' (আবদুল মান্নান, ১৯৮৭: ৪৮)

আবদুল মান্নান সৈয়দই সম্ভবত প্রথম খেয়াল করলেন যে, "প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'বিদ্রোহী' এমনই বিখ্যাত হয় যে তা অচিরাৎ নজরুলের নামের আগে চিরকালের জন্যে যুক্ত হয়ে যায়। ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। মাত্র এক বছর পরে ১৭ জানুয়ারি ১৯২৩ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় শিরোনাম হয় 'বিদ্রোহী কবির কারাদণ্ড'। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বিদ্রোহী শব্দটি যে নজরুলের পূর্বে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়, তার প্রমাণ ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার এরকম বাক্য: 'গতকাল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের অভিনন্দন-উৎসব সোৎসাহে সম্পন্ন হইল'।" সেইসঙ্গে আবদুল মান্নান এ-ও খেয়াল করতে ভোলেননি যে "বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের ঠিক এক বছর পরে ৭ জানুয়ারি ১৯২৩ সালে তাঁর বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশিত হয়। দেখা যায়, তখনই তিনি (কাজী নজরুল ইসলাম) নিজেকে 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।... ১৯২৭ সালে ইবরাহিম খাঁর কাছে লেখা চিঠিতে, ১৯২৯ সালে এ্যালবার্ট হলের সংবর্ধনা-সভাতেও নিজেকে 'বিদ্রোহী' বলে উল্লেখ করেছিলেন।" (আবদুল মান্নান, ১৯৮৭: ৬১)

একইসঙ্গে এ কথাটিও এখানে বলতে হয় যে, আবদুল মান্নান সৈয়দ এ 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে 'নজরুল-মানসের চৈতন্যের পরমতা দেখতে পেয়েছিলেন।' তাঁর মতে, "বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে 'রেনেসাঁসী প্রমূল্যসমূহ তার সবগুলি পাপড়ি মেলেছিলো। ব্যক্তিসত্তার জয়গান পরিপূর্ণ উন্মোচনে ময়ূরের মতো চীৎকার করে উঠেছিলো। উনিশ শতাব্দীর বাংলা দেশেই জয়ী হয়েছিলো দেবত্বের উপর মানবত্বের সাধনার ধারা। মানবজাতির প্রবাহে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি মূল্যবান। এই বোধ মাইকেলের মতো রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলেও আর একবার তীব্র প্রজ্জ্বলিত।" শুধুই এটুকু বলেই তিনি থামেননি, বরং সমালোচনার তীব্র আসক্তির উপর ভর দিয়ে আরো বলেছিলেন, "আধুনিক বাংলা কবিতায় মাইকেলের 'সেই আমি' থেকে ব্যক্তিসত্তার যে-জয়গাথা শুরু হয়েছে, 'বিদ্রোহী'-র অসংখ্য আমি-র রেণুকণায় তা মিশে আছে। রেনেসাঁসী প্রমূল্যে ব্যক্তিবিকাশে যে-অমেয় আশাবাদ এই কবিতায় তা অবিরল স্পন্দিত হচ্ছে

প্রায় রেনেসাঁসী প্রমূল্যসমূহের হৃৎস্পন্দনের মতো।" (আবদুল মান্নান, ১৯৮৭: ৭১) কবিতাটির বিষয়ে সমালোচক আরো বলেছিলেন, "বিদ্রোহী'র কেন্দ্রনায়ক যে শিব, তার ধ্বংসশীলতা ও সৃজনশীলতা এই কবিতারও সারাৎসার। বস্তুত সম্পূর্ণ নজরুল-কাব্যেরই কেন্দ্র-কথা ঐ পুরনো ধ্বংস ও নতুনের উত্থান। নিজেকে নটরাজ, সাইক্লোন, ধ্বংস ইত্যাদি ঘোষণার পরেই নিজেকে তিনি আবার গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, চঞ্চল মেয়ের ভালোবাসা বলে অনুভব করেন। ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নতুন সৃজন বেদন – নজরুলই লিখেছিলেন অন্যত্র। এ তাঁর সমগ্র কাব্যের এবং 'বিদ্রোহী'রও মর্মবাণী।" তাঁর আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আবদুল মান্নান সৈয়দ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, "বিদ্রোহী' শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্পদ নয়, বিংশ শতাব্দীর সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতম।" (আবদুল মান্নান, ১৯৮৭: ৮৫) আবদুল মান্নান সৈয়দের কথার সূত্র ধরেই কাজী আবদুল ওদুদের কথা আমাদের মনে পড়ে। তিনি নজরুলের কবিকৃতির কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "বিদ্রোহী'তে তাঁর মানসিক কুয়াসা এতখানি কেটে যায় যে, তিনি যেন এক নতুন জীবন নিয়ে জেগে ওঠেন, নিজেকে ও জগৎকে দেখতে আরম্ভ করেন এক নতুন দৃষ্টিতে।' (কাজী আবদুল, ১৯৮৩: ৮২) নজরুল-সাহিত্যের যথাযথ পর্যালোচনার জন্যে কবির এ দেখার দৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করাটাও কখনো-কখনো জরুরি হয়ে ওঠে।

### শ্রদ্ধার পাশাপাশি শ্রাদ্ধ: এক

নজরুলের কবিতা নিয়ে এসব ইতিবাচক আলোচনার একটা উল্টোপিঠও রয়েছে। সেই বিষয়টিও আমাদের খানিকটা হলেও জানা দরকার। জানা দরকার একদিকে যেমন সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনে, অন্যদিকে নজরুল-সাহিত্যের সমালোচনার ইতিহাস বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য। তবে, এ ক্ষেত্রে এটুকু সাবধানতার প্রয়োজন যে সাহিত্যের বিপরীত মতটা যেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষে গিয়ে না-পৌঁছোয়। তাহলে সেটি আর সাহিত্যের পর্যায়ে থাকে না, একটা কদর্য আখ্যানে পরিণত হয়।

'আমি কেন লিখি?' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি গোলাম মোস্তফা বলেছিলেন, 'দেহের প্রয়োজনে ভাত খাই, আত্মার প্রয়োজনে লিখি।' তিনি এ-ও পর্যন্ত বলেছিলেন, 'আমার লেখার উদ্দেশ্য... যতটা না সত্য-প্রকাশ, ততটা আত্ম-প্রকাশ।' আর তাই সে-প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই তিনি আমাদের আরো জানিয়েছিলেন, 'আমার লেখায় তাই আমি প্রকাশিত হব, নানা বৈচিত্র্যে নানা রসে নানা ছন্দে নানা গানে আমি স্পন্দিত হব, নিখিল মনে আমাকে নিয়ে জাগবে বিস্ময়, জাগবে কৌতূহল, জাগবে নব নব জিজ্ঞাসা – এই বিপুল আত্মচেতনা ও অহমিকা থেকেই আমার সব লেখা উৎসারিত হয়।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬২: ১৭১) তিনি এ-ও বিশ্বাস করতেন যে, 'নিজের জন্য প্রত্যেকেই লেখে।' আর সে-কারণেই দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'লেখকের সঙ্গে তাই সমাজের

নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সমাজের কথা তাকে ভাবতে হয়। লেখকের ভাব ও চিন্তাধারা যদি সমাজ-মনে সংক্রমিত না হয়, বা নিখিল বিশ্বে তার ঠাঁই না মেলে, তবে সেও মরে যায়, তার সৃষ্টিও মরে যায়। এইজন্যেই তাকে সমাজ-সচেতন হতে হয়।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬২: ১৭২) একজন সাহিত্যিকের এ মনোভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রণোদিত করে। অথচ সেই গোলাম মোস্তফা যখন নজরুলের কাব্যের সমালোচনা করছেন, তখন তিনি তাঁর উপর্যুক্ত কথাকেই যেন নানাভাবে অস্বীকার করেছিলেন। গোলাম মোস্তফা নজরুলের কৃতিত্ব স্বীকার করেই প্রথমে বলেছেন, "নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা এক অদ্ভুত সৃষ্টি। বলিষ্ঠ পৌরুষব্যঞ্জক ভাবের যতো কবিতা এ যাবত বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছে, তন্মধ্যে 'বিদ্রোহী' নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়। এমন তেজস্বিনী ভাষা, বিপ্লবী ভাবধারা, শব্দ-সম্পদ, উপমা ও আবেদন খুব কম কবিতায় দেখা যায়।" (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ১৬০) শুধু এটুকুই নয়, আমরা দেখব, এমনকি কবি-দার্শনিক ইকবালের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেছিলেন, "ইকবালের মতে 'আমি আছি' এই কথা যে যতোখানি প্রতিপন্ন করতে পারবে, সে ততোখানি শক্তিমান। এই হিসাবে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।" এমনকি, তাঁর মতে, "বল বীর/বল উন্নত মম শির।' এর চেয়ে বলিষ্ঠ আত্ম-প্রতিষ্ঠার বাণী আর কি হতে পারে?' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ১৬১)

অন্যদিকে, খানিকটা অবাক হয়েই আমরা দেখতে পাই যে, সেই একই গোলাম মোস্তফা ওই প্রবন্ধের মধ্যেই বলেছেন, "ইকবাল যে খুদির প্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন, 'বিদ্রোহী' ঠিক সেই আদর্শের নয়।" মোস্তফার মতে, 'বিদ্রোহী' রচনার মূল প্রেরণা হচ্ছে, 'জ্ঞানের অহমিকা'। শুধু তা-ই নয়, গোলাম মোস্তফা তাঁর কথাকে সবিস্তারে বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় "প্রেমের কমনীয়তা এতে নেই। প্রেমহীন জ্ঞানের এই পরিণতি। অবশ্য কেউ বলতে পারেন: অন্যায় ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে আমাদের 'বিদ্রোহী' হতে হবে। কিন্তু সেখানেও বিদ্রোহের কথা আসে না।" কেন আসে না? তার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোলাম মোস্তফা মন্তব্য করেছিলেন, 'শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তো মানুষ হিসাবে কর্তব্য। বিদ্রোহের কোনো কথা নয়, তার সঙ্গে করতে হবে আমাদের জেহাদ। বিদ্রোহের কথা উঠলে তো মিতালীর কথা আগেই স্বীকার করা হয়ে যায়। কাজেই বিদ্রোহের কথা অবান্তর। ইসলামে তাই কোনো বিদ্রোহের কথা নেই, আছে দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা। বিদ্রোহ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধেও যেমন চলে না, শয়তানের বিরুদ্ধেও চলে না।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ১৬২) এভাবে সাহিত্যের আলোচনার গতিমুখকে তিনি ধর্মের আলোচনার দিকে ফিরিয়ে রাখলেন।

## শ্রদ্ধার পাশাপাশি শ্রাদ্ধ: দুই

অন্যসব সমালোচকের মতো গোলাম মোস্তফাও আমাদের জানাচ্ছেন, '*অগ্নি-বীণা*

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৩২৯ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে মোট ১২টি কবিতা আছে।... এর ভিতরে ৭টি ইসলামী ভাবাপন্ন, বাকী ৫টি ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ১৯১) তিনি একটি তালিকাও প্রণয়ন করে পাঠকদের জানিয়ে দেন যে, 'প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু।' – 'ভাবের দিক দিয়াও এইসব কবিতা অত্যন্ত অগভীর ও পশ্চাৎমুখীন। কাজেই অবশ্য বর্জনীয়' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ১৯৬) নজরুলের আরেকটি বিখ্যাত কবিতা 'ধূমকেতু'-কে গোলাম মোস্তফা 'বিদ্রোহী' কবিতার 'ছোট ভাই' হিসেবে উপহাস করেছেন। কেন ছোট ভাই? না, সেখানে নজরুল যে বলেছেন, 'আমি বসিব বলিয়া পেতেছে ভবানী ব্রহ্মার বুকে পিঁড়ি'! এরপরে, গোলাম মোস্তফা বলেছেন, নজরুলের'অবশিষ্ট কামাল পাশা, আনোয়ার, রণভেরী, শাতিল-আরব, খেয়াপারের তরণী, কোরবাণী ও মুহর্‌রম ইসলামী আদর্শে ও ধ্যান-ধারণায় অত্যুজ্জ্বল। কামাল পাশার মতো সামরিক ছন্দের কবিতা বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয়টি নাই। খেয়াপারের তরণীও ভাব-গাম্ভীর্যে অনবদ্য।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ১৯৬)

অন্যদিকে, নজরুলকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে তীব্রভাবে নারাজ ছিলেন গোলাম মোস্তফা। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, 'নজরুলকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু নজরুলের সবচেয়ে বড় অপবাদ যদি কিছু থাকে, তবে এই। নজরুল যা নন, তাঁর উপর তাই আরোপ করিলে তাঁকে হেয় করা হয়।' নজরুলের অপরাধ হচ্ছে এই যে, "পাকিস্তানের কবি হওয়া তো দূরের কথা, নজরুল ছিলেন ঘোর পাকিস্তান বিরোধী। তিনি গাহিয়াছিলেন 'অখণ্ড ভারতের' গান।" (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ২৫১)

**শ্রদ্ধার পাশাপাশি শ্রাদ্ধ: তিন**

নজরুলকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতে গোলাম মোস্তফা যে খানিকটা অস্বস্তিতে ভুগেছেন, সেটির প্রমাণ আমরা তাঁর লেখার মধ্যেই পাই। নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে তাই তাঁকে সেদিন 'নজরুল-কাব্যের অপর দিক' প্রবন্ধে বলতে হয়েছিল, 'পাকিস্তানের আলোকে ও ইসলামের আলোকে নজরুল-কাব্য পাঠ করতে হবে।' এতকিছুর পরেও তিনি নজরুলের কৃতিত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেননি। যে-কারণে বলেছেন, 'নজরুল ইসলাম এ যুগের একজন ক্ষণজন্মা প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অপরিসীম। বলিষ্ঠ প্রকাশ-ভঙ্গি দ্বারা, নব নব শব্দ-সম্পদ দ্বারা, মৌলিক চিন্তা ও ভাবধারা দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সত্যই তিনি সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সঙ্গীতেও তাঁর দান অনন্যসাধারণ। বস্তুত তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের কোনোই প্রশ্ন নাই।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ২৩৪) তাহলে নজরুলকে এভাবে দ্বিখণ্ডিত করা কেন? সম্ভবত নিজের বিবেক-দংশন থেকে রেহাই পেতেই অনেকটা কৈফিয়তের স্বরে গোলাম মোস্তফা সেদিন বলেছিলেন,

'ইসলামী দর্শন এবং পাকিস্তানের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের আলোকেই আমরা নজরুল কাব্যের বিচার করিয়াছি। আমরা আজ নূতন পথে জয়যাত্রা করিতেছি। প্রথমেই তাই আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শের নির্দেশ একান্ত প্রয়োজন। এইজন্যই আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই অপ্রীতিকর আলোচনায় হাত দিয়াছিলাম।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ২১৫) অনেকটা কাতর-কণ্ঠেই যেন গোলাম মোস্তফা সেদিন লিখেছিলেন, 'নজরুল আজ রোগ-শয্যায় শায়িত। এ অবস্থায় তাঁর কাব্যের বিরূপ সমালোচনা খুবই অশোভন হইল; সন্দেহ নাই।' তাঁর সেই আর্ত-ধ্বনি যেন এত বছর বাদেও আমাদের বুকে এসে বাজে। প্রশ্ন জাগে কোনো চাপের মুখে দাঁড়িয়ে, কোনো কর্তৃত্ববাদীর ইশারায় বাধ্য হয়ে, সেদিন তিনি সাহিত্য-সমালোচনার নামে নজরুলের প্রতি এমন বিরূপতা দেখিয়েছিলেন? তাঁর নিজের ভাষ্যমতে নজরুল সম্পর্কে 'যাহা কিছু বলিয়াছি, ইসলাম ও পাকিস্তানের কল্যাণ কামনাতেই বলিয়াছি।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ২১৫)

**নজরুলের আদ্যশ্রাদ্ধ**

তাঁর কবিতায় জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, 'আমাদের এই শতকের/বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু – বেড়ে যায় শুধু;/তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়/জ্ঞান নেই আজ পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।' (জীবনানন্দ, ১৯৮৮: ১৩৮) কথাগুলো আবারো মনে পড়ে যখন আমরা হুমায়ুন আজাদের নজরুল-সমালোচনা পাঠ করি। সাহিত্য-বিচারে বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা করা সত্ত্বেও (বুদ্ধদেবের সমালোচনাকে আজাদ বলেছিলেন: 'মর্মভেদী রচনা'), কার্যত তাঁরই স্বভাবের বিপরীতে দাঁড়িয়ে হুমায়ুন আজাদ লেখেন, 'আমরা শৈশবের স্খলনপতনভরা কাব্যপ্রচেষ্টাতেই তিরিশমুখি হয়ে উঠি। ষাট-সত্তরের দশকে যে-তরুণ শব্দে আনন্দ আবিষ্কার করেছে, তার সামনে মোহ ছড়াতে পারেননি নজরুল। এমনকি এমন ঘটনাও অস্বাভাবিক নয় যে নজরুল নামী কোনো কবির অস্তিত্বই সে অনুভব করেনি, তাকে সারাক্ষণ ডেকেছে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে।' (হুমায়ুন, ১৯৯২: ৩৪) তাঁর আরেকটি লেখায় হুমায়ুন আজাদ অনেকটা বুদ্ধদেবকে একেবারে সরাসরি অনুকরণ করেই বলেছিলেন 'বাঙলা লেখকদের লেখা পড়ার সময় বিব্রত বোধ করি বারবার। আমাদের প্রধান লেখকদের মধ্যেও মৌলিকত্ব শোচনীয়রূপে কম, যখন তাঁরা চিন্তা করেন তখন তাঁরা অনেকটা শিশু।' (হুমায়ুন, ২০১১: ৪০) আজাদের এই 'বিব্রত' প্রবণতার প্রধান শিকার সম্ভবত কাজী নজরুল ইসলাম। কেননা, আজাদ জানিয়েছিলেন, 'তরুণ বয়স থেকেই অস্বস্তি বোধ করি আমি নজরুলের লেখা পড়ার সময়; তিনি মাঝারি লেখক বলে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত লেখক বলে। তিনি ভারী বোঝার মতো চেপে বসে আছেন বাঙালি মুসলমানের ওপর।' নজরুল-বিষয়ে তিনি নিজেও একসময় বিভ্রান্ত ছিলেন, এমনটাই যেন বলে উঠেছিলেন, 'প্রচারে প্রচারে তাঁকে আমি বিদ্রোহী বলেই মনে করেছি যখন বালক ছিলাম, বেশ কিছু গদ্যেপদ্যে দেখেছিও তাঁর বিদ্রোহীরূপ।' কিন্তু পরে গিয়ে তিনি যেন বুঝতে পেরেছিলেন যে আদতে নজরুল হচ্ছেন,

'বাঙলা ভাষার বিভ্রান্ত কুসংস্কার-উদ্দীপ্ত লেখকদের মধ্যে প্রধান।' (হুমায়ুন, ২০১১: ৪০) আমাদের মনে খেদ থেকে যায় এ কারণে যে, তাঁর বক্তব্যের পক্ষে নমুনা হিসেবে হুমায়ুন আজাদ এমন কোনো দৃষ্টান্ত দেখাননি, যাতে করে সেটিকে খানিকটা হলেও চিন্তার মধ্যে রাখা যায়। এর কারণ হচ্ছে, আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদের ধারণা মারাত্মকভাবে একমুখীন। তিনি এর বৈচিত্র্য, এর উপসর্গগুলো ঠিকভাবে বুঝতেন কিনা, সেই সন্দেহ খানিকটা রয়েই যায়। একজন কবির চেতনায় আধুনিকতার নানান লক্ষণের উপস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি মণীন্দ্র গুপ্ত আমাদের জানিয়েছিলেন, 'একজন প্রকৃত কবির চেতনায় জীবন ও পৃথিবী সবসময়েই অফুরান। প্রেমের কবিতার পরে অপ্রেমের কবিতা, উদাসীনতার কবিতা, শান্তির কবিতা, একাকীত্বের কবিতা, ভয়ের কবিতা, মৃত্যুর কবিতা আসতে পারে। নিজেকে ছাড়িয়ে আরো কত বিচিত্র কবিতা আসতে পারে।' (মণীন্দ্র, ২০২১: ১২৬) কবির চেতনায় জারিত এই বৈচিত্র্যটাই আধুনিকতার প্রধানতম লক্ষণ। অন্যদিকে, বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'একটি ভালো রচনা সমস্ত সমালোচনার সারাৎসার।' আর সেজন্যই তাঁর মনে হয়েছে, 'সমালোচনা ভালো-মন্দ বাছাই করতে শেখায়।' (বুদ্ধদেব, ১৯৮৪: ১৩৫) এর পাশাপাশি তিনি এটিও বলেছেন, 'সমালোচনার কাছে শেষ কথা যদি কখনো আশা করি, তাহলেই আমরা ভুল করবো। সাহিত্য বা শিল্পকলা এমন বিষয়, যা নিয়ে শেষ কথা কেউ কখনো বলতে পারেনি, বলতে পারে না।' (বুদ্ধদেব, ১৯৮৪: ১৩৮) তিনি একেবারে সুনির্দিষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন, 'যাকে exact science বলে, সমালোচনার প্রকৃতি ঠিক তার বিপরীত। এখানে সবই আপেক্ষিক, সবই আনুমানিক, সবই মোটামুটি কথা।' (বুদ্ধদেব, ১৯৮৪: ১৩৮) অন্যদিকে, হুমায়ুন আজাদ তাঁর সমালোচনায় যেন শতভাগ অনমনীয়, নির্ভীক। এ ধরনের সমালোচনাকে বুদ্ধদেব অনেক বছর আগেই খারিজ করে দিয়েছেন। সেইসঙ্গে এটিও বলবার যে, নজরুলের ইসলামী কবিতা, এমনকি কোনো গানের মধ্যেও হুমায়ুন আজাদ কোনো বিদ্রোহীকে পাননি, বরং পেয়েছেন 'একজন ইসলাম অন্ধ' ব্যক্তিকে (হুমায়ুন, ১৯৯২: ৪২)।

## সকলেই কবি নন, নজরুল কবি: এক

'কবি কে?' – এ প্রশ্নের উত্তরে খুবই সংক্ষেপে অথচ তাৎপর্যপূর্ণভাবে জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, 'কবি তো সেই মানুষই যিনি সত্যকে অনুভব করতে পারেন এবং ভাষার আবেগ-প্রদীপ্তির সাহায্যে আমাদের হৃদয়ের ভিতর পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। অর্থাৎ কবির সত্য হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করলাম।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ১২৬) নজরুলের কবিতা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ মনে রেখেছিলেন যে, 'কোনও এক যুগে মহৎ কবিতা বেশি লেখা হয় না।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ২০৩) তাঁর মনে হয়েছে, 'নজরুল ইসলাম-এর লেখায় মহাকবিতার গভীর প্রসাদ নেই, তাঁর প্রতিশ্রুতিও কম।' কিন্তু সেইসঙ্গে তিনিই আবার এমন প্রশ্ন উত্থাপন করতে দ্বিধা করেননি যে, 'কোনও এক যুগে ক'জনের কবিতায়ই-বা তা থাকে?' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ২১১) সম্ভবত এরই সূত্রে তিনি

বলেছিলেন, 'নজরুল-এর কবিতার এমন অনেক গুণ আছে, যে-সবের সঙ্গে আজকের বাংলা কবিতার একটা প্রধান প্রাণতরঙ্গ মোটেই সমধর্মী নয়। এক-কথায় বলতে পারা যায় যে, অনেক আধুনিক বাংলা কবিতারই মর্মবাণী ভেদ করা কঠিন, কিন্তু নজরুল-এর কবিতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়... নজরুল-এর কবিতায় অর্থসারল্য আছে, ওজস্‌ও রয়েছে এক হিসেবে।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ২১১) এটিই হচ্ছে সমালোচকের সেই 'নৈর্ব্যক্তিক গুণ', যার কথা নানাভাবে অমিয় চক্রবর্তী থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু দে বলে গিয়েছেন। সমালোচকের সেই শক্তির উপর ভর দিয়েই জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, 'কাব্যের সুর এক আশ্চর্য বৈদেহী পবিত্রতায় নিজের ধ্রুবলোকে পৌঁছেছে, ও-রকম দাবি নজরুল-এর কবিতা সম্পর্কে করা যায় না।... কাজীর কবিতা বিশেষ একটা মাত্রার দেশে তার অতীতের ভিতরে পরিসমাপ্ত।... কিন্তু তবুও এই শতাব্দীর এই দশকেও আমাদের দেশে কাজী নজরুল-এর কবিতার জন্যে সাধারণ পাঠক যে-আকর্ষণ বোধ করেন, অন্য কারও কবিতার জন্যে তা করেন কি-না সন্দেহ।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ২১১-২১২) নিজের কথাকে একটা যৌক্তিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে *শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়* (১৩৫৪) জীবনানন্দ বলেছিলেন, 'বাংলার এ-মাটির থেকে জেগে, এ-মৃত্তিকাকে সত্যিই ভালোবেসে আমাদের দেশে ঊনিশ শতকের ইতিহাসপ্রান্তিক শেষ নিঃসংশয়তাবাদী কবি নজরুল ইসলাম তাঁর জনপ্রেম দেশপ্রেম পূর্বোক্ত শতাব্দীর বৃহৎ ধারার সঙ্গে সত্যিই একাত্ম। পরবর্তী কবিরা এ-সৌভাগ্য থেকে অনেকটা বঞ্চিত বলে আজ পর্যন্ত নজরুলকেই সত্যিকারের দেশের ও দেশীয়দের বন্ধু কবি বলে জনসাধারণ চিনে নেবে। জনের ও জনতার বন্ধু ও দেশপ্রেমিক কবি নজরুল।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ২১৫)

## সকলেই কবি নন, নজরুল কবি: দুই

কবি গোলাম মোস্তফা বা কবি-প্রাবন্ধিক হুমায়ুন আজাদের মতো সমালোচকদের কথা বিবেচনায় রেখেই আবু সয়ীদ আইয়ুবকে আবারও স্মরণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। 'রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী কাব্যধারা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আইয়ুব বলেছিলেন, 'রবীন্দ্র-পরবর্তীদের মধ্যে জনগণের কবি প্রকৃতপক্ষে নজরুল ইসলামকেই বলা চলে। জনগণের নাড়ী কোনখান দিয়ে বয়, সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অব্যর্থ।' (আইয়ুব, ২০২২: ৪৬৪) আইয়ুব এ-ও বলেছেন যে, 'সাহিত্যকে যদি জীবনের সমালোচনা বলা হয়, তা হলে নজরুল ইসলাম বড় সাহিত্যিক বলে গণ্য হতে পারেন না।' এটি বলার পরেও নজরুল-সাহিত্যের আরেকটি প্রবণতার দিকে দৃষ্টিপাত করে আইয়ুব জানিয়েছিলেন, 'সাহিত্যিক তো শুধু সমালোচক নয়, সমাজের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির সে প্রতিফলকও বটে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আধুনিক বাংলা কাব্যে নজরুলের তুলনা নেই।' আর এরপরই আইয়ুব সিদ্ধান্ত টানেন এই বলে যে, 'বাংলার বুকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিদ্রোহের যে-আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই আগুনের স্পর্শে তাঁর বীণা হল অগ্নিবীণা। জাতীয় বিপ্লবের তিনিই সার্থক সাহিত্যিক প্রতিভূ।' (আইয়ুব, ২০২২: ৪৬৪) আবার

এ বিশ্লেষণের খানিকটা কাছাকাছি এসে, শিল্প-সাহিত্যের মৌলিক তাৎপর্যের একটা সন্ধান দিতে গিয়ে অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক সৈয়দ আকরম হোসেন বলেছেন, 'যে-কোন শিল্পস্রষ্টার অন্তর্গত ব্যাকরণ হলো তাঁর আবেগ-স্পন্দিত চেতনা; এবং সে-চেতনাপুঞ্জ বিদ্যুৎশক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপরিবর্তী ও তলবর্তী শক্তিপ্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে, আকর্ষণে-বিকর্ষণে। বিদ্যুৎপূর্ণ প্রজ্বলন্ত প্রতিভা কখনোই অবলম্বহীন দোদুল্যমান নয়; মূলত সে অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় কারণে দ্রুত চেতনা থেকে অবচেতনায় এবং অচেতনায় সঞ্চরণ ছিল।' (সৈয়দ আকরম, ১৯৮৫: ৬৭) সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে কথাগুলো মনে রাখা জরুরি। যে-কারণে এরই ভিত্তিতে, হুমায়ুন আজাদের একেবারে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক সৈয়দ আকরম হোসেন বলেছেন, 'কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভান-শক্তির উৎসবিন্দু কিংবা সংবেদন-বলয়ের পরিসীমা বিন্দুসংহত-অভিজ্ঞতায় সংস্থিত নয়, মূলত অভিজ্ঞতা-বিশেষিত হৃদয়াবেগে শিল্পদীক্ষিত। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু-মধ্যবিত্তের ক্রম-অপসৃয়মান, ভগ্নপক্ষ, নৈরাশ্যময় ও চূর্ণস্বপ্ন সমাজচেতনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে নবজাগ্রত বাঙালি মুসলমান-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনাস্পর্শী নজরুল ছিলেন মূলত তারুণ্যশাণিত, আবেগে-সংরাগে উচ্চকিত, জীবনার্থে স্বপ্নময় ভবিষ্যতে বিশ্বাসী, অস্তিত্ব-বিস্তারে সীমাহীন, রোমান্টিক অনুভবে প্রেম-সৌন্দর্য-মুগ্ধ এবং অচরিতার্থতা ও ব্যর্থতায় ছিলেন প্রতিবাদী, বিদ্রোহী।' (সৈয়দ আকরম, ১৯৮৫: ৬৭) বুদ্ধদেব বসুর মতো সৈয়দ আকরম হোসেনও নজরুলকে রোমান্টিক কবি হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, 'তাঁর কবিস্বভাব রোমান্টিকতার বিচিত্র উপাদানে সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিপুষ্টি লাভ করেছে। নজরুলের প্রেমসংক্রান্তচেতনা, রহস্যবোধ; প্রকৃতির বিচিত্রতায় আত্ম-অনুভূতির সঞ্চারণ; আবেগের তীব্রতা; অনুভূতির তীক্ষ্ণতা; চিত্রসৃষ্টিতে আতিশয্য; ফর্মের প্রতি অমনোযোগ; সমগ্র কবিতার মধ্যে অংশ-বিশেষের শিল্প-সার্থকতা এমনকি তাঁর বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ রোমান্টিক মানসিকতা-জাত।' (সৈয়দ আকরম, ১৯৮৫: ৮১) নজরুলের বিশ্বাসপ্রবণতাকে পাঠকের সামনে এনে সৈয়দ আকরম হোসেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন, "নজরুলই একমাত্র যিনি সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক। তিনি ভারতীয় মিথ, এশিয় মিথ, (যাকে লোকে মুসলিম মিথ বলে, আমি বলি না। আমি বলি পশ্চিম এশিয় মিথ।) এগুলোকে তিনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তা অন্য কেউ করেননি। একটি বাক্য, ডুবে যাচ্ছে কে সে? 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন। কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।' এই নজরুলের আকাশচুম্বি অসাম্প্রদায়িকতার বিশালতা এবং সর্বমিথকে আত্মীকৃত করে যে সাহস, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ – এই জিনিসটি কিন্তু আর কারো মাঝে নেই।" (সৈয়দ আকরম, ২০২২: ২৪) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অহেতুক তুলনা টেনে নয়, বরং নজরুলের কৃতিত্বটাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ তো রবীন্দ্রনাথ। তিনি একেবারেই আলাদা। আমি বলছি, পরবর্তীকালে সক্রিয় যে ব্যক্তিটি তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। এরকম স্পষ্ট করে বলেননি কেউ। কিন্তু আমাদের এখানে নজরুলের

গানের চর্চাই হয়েছে। নজরুলের যে বোধের চর্চা, মেধার চর্চা, আবেগের চর্চা, তাঁর যে অসাম্প্রদায়িক চর্চা, এই চর্চার প্রান্তগুলো কিন্তু ওইভাবে উন্মোচিত হয়নি।' নজরুল সম্পর্কে সৈয়দ আকরম হোসেন তাঁর সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে বলেন, 'কাজী নজরুল ইসলামকে যদি আমাদের ভারতীয় আদর্শের মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করা হতো, তাহলে আমাদের ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হতো।' (সৈয়দ আকরম, ২০২২: ২৪) শুধুই রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, আমাদের সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, আমাদের সমালোচনার ধরনটাও খানিকটা ভিন্ন হতো, আজকের মতো এতটা অসহনশীল আর অযৌক্তিক যে হতো না, সেটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

## জীবন্ত কবি নজরুল

এ ইতিহাস অনেকেরই জানা আছে যে, ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার এলবার্ট হলে সওগাত-পরিকল্পিত এক নজরুল-গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন – জলধর সেন, সুভাষচন্দ্র বসু, অপূর্বকুমার চন্দ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, এস ওয়াজেদ আলী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। (অরুণকুমার, ২০১৭: ৪২১) সে অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'আজ বাংলার কবিকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।... নজরুল কবি – প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি; তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন। আজ আমি এই ভেবে বিপুল আনন্দ অনুভব করছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাংলার কবি, বাঙালির কবি!... কবিরা সাধারণত কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তা নন। কারাগারের শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন তা বাঙালির প্রাণে এক নতুন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।' (অরুণকুমার, ২০১৭: ৪২২)

ওই গণ-সংবর্ধনায় রাজনীতিবিদ সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'স্বাধীন দেশে জীবনের সহিত সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নাই। দেশ পরাধীন বলে এদেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুলে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানাদিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন।... এতেই বুঝা যায় যে নজরুল একটা জীবন্ত মানুষ।' (অরুণকুমার, ২০১৭: ৪২৪) নজরুলকে জীবন্ত মানুষ আখ্যা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, সেইসঙ্গে এ কথাগুলোও বলেছিলেন, 'কারাগারে আমরা অনেকে যাই; কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ।' কাজী নজরুল ইসলামকে তিনিও 'বিদ্রোহী

কবি' হিসেবে স্বীকার করে জানিয়েছিলেন, 'নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয় – এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব – তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব তখনও তাঁর গান গাইব।' (অরুণকুমার, ২০১৭: ৪২৪)

## উত্তেজনাময় কিন্তু শৃঙ্খলাপূর্ণ কাজ

মানুষের চিন্তাধারার পদ্ধতি ও সেইসঙ্গে তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কমরেড মাও সে-তুঙ বলেছিলেন, 'আমাদের প্রয়োজন হলো উৎসাহী কিন্তু স্থিরচিত্ত মনোবৃত্তির, উত্তেজনাময় কিন্তু শৃঙ্খলাপূর্ণ কাজের।' নজরুলের কাব্য, বিশেষভাবে তাঁর *অগ্নি-বীণা* যেন মাওয়ের এ কথার শৈল্পিক উপস্থাপনায় প্রতিভাসিত। আর সেইসূত্রে বদরুদ্দীন উমরের কথাটি আবারও আমাদের স্মরণ করতে হয় যে, 'আজ প্রয়োজন সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এই নজরুলপ্রীতি ও নজরুল-সাহিত্যচর্চার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা।... তার জন্যে প্রয়োজন নজরুল-সাহিত্যের, নজরুল-সঙ্গীতের এবং নজরুল-জীবনের সত্যিকার চিত্র জনসাধারণ ও সংস্কৃতিকর্মীদের সামনে উপস্থিত করা।' আর, 'এভাবেই সৃষ্টি করতে হবে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সুস্থ চেতনার, যে-চেতনা সক্ষম হবে আমাদের সামগ্রিক জীবনকে সুন্দর ও শোষণমুক্ত করতে।' (বদরুদ্দীন, ২০০৪: ৪৪) যুদ্ধের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া নয়, বরং, 'পরিমিত টানে' স্রোতের বিপরীতে সাঁতরিয়ে তীরে পৌঁছানোকে কমরেড মাও সে-তুঙ গুরুত্ব দিয়েছিলেন (মাও, ১৯৭৯: ৫৮)। নজরুলের *অগ্নি-বীণা*র কবিতাগুলো এক অর্থে কমরেড মাওয়ের সেই বক্তব্যেরই শৈল্পিক তাৎপর্যে প্রকাশিত। একজন আত্মসচেতন কবির কাব্যকর্ম শেষ পর্যন্ত তো তা-ই, তা সেইভাবেই বিকশিত হয়।

## শেষ নাহি যে

নজরুলের কাব্যে যে-সাবলীল বেগের কথা বলা হয়ে থাকে, সেটি আমাদের শিল্প-চৈতন্যে নতুন কাব্যবোধের জন্ম দিক, জন্ম দিক নতুন-নতুন সমালোচনার রীতি-পদ্ধতিরও । কথা আপাতত এটুকুনই।

## সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি

অরুণকুমার বসু, ২০১৭ (প্রপ্র. ২০০০)। *নজরুল-জীবনী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, ১৯৮৭। *নজরুল ইসলাম: কালজ কালোত্তরে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, মার্চ ২০১৬। *আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি:* চতুর্থ খণ্ড, অনু হোসেন সংকলিত ও সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, জুন ২০১৬। *আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি:* পঞ্চম খণ্ড, অনু হোসেন

সংকলিত ও সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবু সয়ীদ আইয়ুব, ২০২২। *রচনাসংগ্রহ*, পূষন আইয়ুব ও চম্পাকলি আইয়ুব সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

কাজী আবদুল ওদুদ, ১৯৮৩ (প্রপ্র. ১৯৫১)। *শাশ্বত বঙ্গ*, ব্রাক, ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম, ২০০৬। *নজরুল-রচনাবলী* (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ), সম্পাদনা-পরিষদ: রফিকুল ইসলাম গয়রহ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম, ২০১৬ (প্রপ্র. ১৯৯৭)। *প্রবন্ধ-সমগ্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

গোলাম মোস্তফা, ১৯৬২। *আমার চিন্তাধারা*, পরিবেশক: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮। *প্রবন্ধ-সংকলন*, মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ, ২০০৯। *সমগ্র প্রবন্ধ*, ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত, প্রতিক্ষণ, কলকাতা।

বদরুদ্দীন উমর, ২০০৮ (প্রপ্র. ১৯৬৮)। *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু, ১৯৮৪ (প্রপ্র. ১৯৪৬)। *কালের পুতুল*, নিউএজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ১৩৬১। *সাহিত্যচর্চা*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

মণীন্দ্র গুপ্ত, ২০২১ (প্রপ্র. ২০০৩)। *জনমানুষ ও বনমানুষ*, কিশলয় প্রকাশন, কলকাতা।

মাও সে-তুঙ, ১৯৭৯। *রচনাবলী: নির্বাচিত পাঠ*, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং।

মীনাক্ষী দত্ত, ১৩৯৫। *বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা*, সংকলন: ২, প্যাপিরাস, কলকাতা।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০১৫ (১৯৮৩)। *সমকালে নজরুল ইসলাম*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

মোহিতলাল মজুমদার, ১৯৬৯। *মোহিতলালের পত্রগুছ*, আজহারউদ্দীন খান ও ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ।

মোহিতলাল মজুমদার, ২০০৬ (প্রপ্র. ১৩৫৪)। *সাহিত্য-বিচার*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

সুকুমার সেন, ২০১০ (প্রথম আনন্দ সংস্করণ: ১৯৯৯)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*: পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৯৮৫। *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন, ২০২২। *উত্তরাধিকার*, বর্ষ ৪৫, সংখ্যা ১৩, মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯২। *আধার ও আধেয়*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ, ২০১১। *আমার অবিশ্বাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Buddhadeva Bose, 1982 (1948). *An Acre of Green Grass*, Papyras, Calcutta.

C. Day Lewis, 1957. *The Poet's Way of Knowledge*, Cambridge University Press, Cambridge.

Johann Peter Eckermann, 1951 (1946). *Conversations with Goethe*, Everyman's Library, London.

Sushil Kumar De, 1962 (1919). *Bengali Literature in the Nineteenth Century (1757-1857),* Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta.

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৮ ॥ সংখ্যা : ১-২ ॥ ফাল্গুন ১৪২৯ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

# অগ্নি-বীণার শতবর্ষে নজরুল-সমালোচনার সংক্ষিপ্ত রূপালেখ্য

সৌভিক রেজা*

**সারসংক্ষেপ:** বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুলকেই আমরা বলতে পারি একজন প্রতিভাবান কবি। শুধুই যে প্রতিভাবান তা নয়, একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন মৌলিক কবি। নজরুলের *অগ্নি-বীণা* কাব্য প্রকাশের পরপরই তাঁকে একজন যুগ-প্রবর্তক কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই কাব্যে নজরুল, তাঁর যুগটিকে, তাঁর সমকালকে বিচিত্রভাবে বুঝে নেয়া আর তাকে শৈল্পিক প্রকাশে চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। নজরুলের কাব্য-অভিযানের অগ্রযাত্রার শুরুটা সেখান থেকেই। এসবের পাশাপাশি আমাদের সাহিত্যে দেখা যায় নজরুলের কাব্য-সমালোচনার একটি নতুন ধারা। নতুন কাব্যরীতির প্রবর্তক ছিলেন বলেই, আমাদের সাহিত্যে, সমালোচকদের একটা বড় অংশ নজরুলের কৃতিত্বের জায়গাটি সুনির্দিষ্টভাবে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। অর্থাৎ নজরুলের কবিতাই শুধু নয়, নজরুলের কাব্যের সমালোচনাগুলো আমাদের সাহিত্যে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। বাংলা সাহিত্যে নজরুল-সমালোচনার সে-ধারা এবং তার নিহিত পালা-বদল এক অর্থে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনারও পালা-বদল বটে। নজরুলের *অগ্নি-বীণা* প্রকাশের শতবর্ষে এসে তাঁর কবিতা আলোচনার পাশাপাশি সাহিত্য-সমালোচনার সে-ধরনটিও আমরা এখানে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করেছি।

## প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত কবি

কবি জীবনানন্দ দাশ বিশ্বাস করতেন যে, 'একজন কবিকে... তাঁর প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত থাকতে হবে; হয়তো কোনও একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতাবৃত্ত প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয়ে মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের খেতে বুননের জন্যে।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ২৩-২৪) আবার সেইসঙ্গে তিনি এটিও বলতে ভোলেননি যে, 'মানুষের শিল্প-সাধনার... বহুমুখিনতার বৈচিত্র্যকে... আমাদের স্বীকার করতে হবে।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ১২৪-১২৫) আমাদের সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে একটা বড় ত্রুটি এই যে কথাগুলোকে আমরা বেশিরভাগ সময়ই ভুলে থাকি। সে-কারণেই আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য খুব বড়-একটা পরিধি জুড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এটি কারো একার নয়, আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতার হাত থেকে নজরুল ইসলামের মতো কবিকেও আমরা রেহাই দিতে পারিনি।

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

## নজরুল ও তাঁর কাব্যপ্রতিভা

কবি-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ জানিয়েছিলেন, '১৯২২ সালে প্রথম নজরুল গ্রন্থকার হিশেবে আবির্ভূত হন, আবার ওই বছরেই তাঁর গ্রন্থ প্রথমবারের মতন বাজেয়াপ্ত হয় – যার স্বাদ উত্তরকালে তিনি পাবেন আরো বারবার।' অন্যদিকে, ওই "১৯২২ সালে প্রথমবারের মতন নজরুল-সম্পাদিত একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, 'ধূমকেতু', আবার ওই বছরেই তাঁরই 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্যে পত্রিকাটিও বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, তাঁকে পালিয়ে থাকতে হয় এবং বছর শেষে ধরা পড়েন, মামলা রুজু হয়, পরবর্তী বছরের শুরুতে ১-বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।" (আবদুল মান্নান, ২০১৬: ৬)

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অগ্নি-বীণা* প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৯২২ সালে (কার্তিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষকে।' (কাজী নজরুল, ২০১২: ৪৩৭) *অগ্নি-বীণা*কে সামনে রেখেই কবি নজরুল ইসলামকে নিয়ে সাহিত্য-সমালোচনার একটা বড় অংশ আবর্তিত হয়েছে। এটি নজরুলের এমন একটি গ্রন্থ, যা কিনা যুবক বয়সের প্রথম পর্যায়ের রচনা হলেও পরবর্তী সময়ের সমস্ত কাব্যপ্রয়াসকে যেন ছাপিয়ে গিয়েছে। যে-কারণে নজরুলের কাব্য-প্রতিভা আর *অগ্নি-বীণা* সমার্থক বলা হলেও খুব বেশি বাড়িয়ে বলা যেমন হয় না, তেমনই আবার এর মধ্য দিয়ে নজরুলের পরবর্তী জীবনের কাব্যচর্চাকে নাকচ করবার একটা সূক্ষ্ম আশঙ্কাও কিন্তু রয়ে যায়। আমরা বাড়িয়েও যেমন কিছু বলতে চাই না, এর পাশাপাশি কোনোকিছুকে নাকচ করবার কূটবুদ্ধি থেকেও যোজন-যোজন দূরে সরে থাকতে চাই। তাহলে আমরা এ প্রবন্ধে কী উপস্থাপন করতে চাইছি? তেমন কিছুই না। *অগ্নি-বীণা*কে সামনে রেখে নজরুল-সমালোচনার একটা রূপরেখা মোটা দাগে পাঠকের সামনে হাজির করতে চেয়েছি।

## নজরুল-সাহিত্যের পটভূমি

নজরুল যে-সময়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝে নেয়াটা বেশ জরুরি। শুধু নজরুলের বেলায়ই নয়, সাহিত্যের যে-কোনো ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেই এটা অত্যাবশ্যক বলে আমরা ধারণা করি। এর কারণটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুশীলকুমার দে বলেছিলেন, 'Every history of literature should always have a back-ground of political and social history.' (Sushil,1962: 5)

নজরুলের সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছিলেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট অর্থ উপার্জনের একমাত্র অবাধ ক্ষেত্র ছিল হাইকোর্ট অথবা জেলা কোর্টে ওকালতি।... দিন দিন... সে ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল।... এমন কি বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে খাস বাঙ্গালারও খানিকটা টুকরা বাহির করিয়া লইয়া

বাঙ্গালা দেশকেই ছোট করিয়া ফেলা হইল। বাঙ্গালীর ঘরের হাতায় যেন প্রাচীর উঠিল।' (সুকুমার, ২০১০: ২৭২) তিনি এ-প্রসঙ্গে আরো জানিয়েছেন, 'মিন্টো-মর্লি রিফর্মের দৌলতে (১৯১০) শাসন ও বিচার বিভাগীয় উচ্চতম চাকরিতে নিতান্ত দুই-চারজন যোগ্য উচ্চশিক্ষিতেরই স্থান হইতে লাগিল। ওকালতি ও শিক্ষকতার দিকে আকর্ষণ না থাকায় এই দুই ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব দেখা দিল। বাঙ্গালীর জেদ যখন জয়ী হইল, বঙ্গভঙ্গ রদ হইল, শাসন-কর্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন ইহাতে বাঙ্গালী শান্ত হইবে। তাহা হইল না, পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবপ্রচেষ্টার অবসান ঘটাইতে পারিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সে প্রচেষ্টায় বাহিরে-চাপা আগুন নিভিল না, ধূম ছাড়িতে লাগিল। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মের (১৯১৯) সান্ত্বনা কার্যকর হইল না। গান্ধীজি নন্‌-কোঅপারেশনের শঙ্খধ্বনি করিলেন, দেশের সর্বত্র হইতে সাড়া জাগিল। প্রমাণ হইয়া গেল যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দেশের মধ্যে দ্বিমত নাই।' (সুকুমার, ২০১০: ২৭২)

নজরুল-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির আলোচনায় এ প্রেক্ষাপট জানাটা জরুরি। কেননা বিংশ শতাব্দীর শুরুর সময়টা নজরুলের সাহিত্যে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর নজরুল নিজেও সেই সময়পর্বকে তাঁর সাহিত্যে, বিশেষ করে কবিতায়, নানাভাবে চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কবি সি. ডে লুইস বিশ্বাস করতেন যে, 'Most poets are stimulated by the ideas of their age, and all must respond to the climate of their times. (Lewis, 1957: 27) আজকের দিনেও এ কথাটির তাৎপর্য ও বাস্তবতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

## কতটা হাবিলদার কতটা কবি

কবি নজরুলের সাহিত্যকর্মের সমালোচনার প্রাথমিক যুগে সমালোচনাগুলোতে দেখব, তৎকালীন পত্রিকাগুলোর সংশ্লিষ্ট সম্পাদক এবং লেখক কোনোপক্ষই ভুলতে পারছেন না যে, তিনি একসময় সৈনিকের চাকরি নিয়ে বাংলার বাইরে গিয়েছিলেন। একটা উদাহরণ দিই – *বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* (ভাদ্র, ১৩২৬) নজরুল-সম্পর্কে লেখা হয়েছে, 'শ্রীকাজী নজরুল ইসলাম বঙ্গ বাহিনীর একজন হাবিলদার। ইনি করাচীর সেনানিবাসের কর্ম-কোলাহলের মধ্যেও মাতৃভাষাকে স্মরণ করিয়াছেন, মাতৃভাষার অনুশীলন করিতেছেন।' সেখানে আরো বলা হয়েছিল, নজরুল "রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্পগুলি পড়িয়াছেন, এবং তাঁহার অনুসরণে 'মুক্তি' লিখিয়াছেন। বাঙ্গালী সৈনিক-শিবিরে যে ভাষার সাধনা করিতেছেন, সে ভাষার আশা করিব না? – অনুকরণ সম্পূর্ণ হইলেও অনুকরণ। এ অনুকরণ সর্বাংশে সফল হইয়াছে, এমন কথাও বলিতে পারি না। কিন্তু একজন নব-ব্রতী মুসলমান রবীন্দ্রনাথের ছন্দের ও ভাষার এতটা সন্নিহিত হইয়াছেন, ইহাও অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।' (মুস্তাফা, ২০১৫: ২৯)

এ-কথা ঠিক যে, নজরুলের প্রথম এবং যথাযথ শৈল্পিক সমালোচনা আমরা পেয়েছি, কবি-সমালোচক-অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদারের কাছ থেকে। শুধু সত্যের খাতিরে নয়; তথ্যের খাতিরে এবং নজরুলের কাব্যকর্মকে বুঝে নিতে পারার স্বার্থেও এ তথ্যটি আমাদের স্বীকার করা উচিত। *মোসলেম ভারত*-সম্পাদককে লিখিত পত্রে (ভাদ্র ১৩২৭) মোহিতলাল বলেছিলেন, 'আমার অনেকদিন হইতে একটি ক্ষোভ ছিল এই যে, বাঙ্গালী হইয়া মাতৃ ভাষার প্রতি উদাসীন থাকায়, মুসলমানগণ আমাদের সর্বাপেক্ষা গৌরবের ধন সাহিত্য ও ভাষাকে তাহার পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছেন না, এবং নিজেরাও তাঁহাদের হৃদয়নিহিত মনুষ্যত্বের স্বধর্ম ও স্বকীয় সাধনার বিশিষ্ট সৌন্দর্যের অবাধ স্ফূর্তির অভাবে প্রাণে-মনে পঙ্গু হইয়া রহিলেন।' (মোহিতলাল, ১৯৬৯: ১) অবশ্য নজরুল যে একজন 'মুসলমান কবি' সেটি মোহিতলাল মজুমদার কখনোই ভুলতে পারেননি, ওই চিঠিতেও নয়। এমনকি নজরুল যে হাবিলদার ছিলেন, সেটিও মোহিতলাল পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। তবে তাঁর প্রেক্ষণবিন্দু ছিল নজরুলের কবিতার শিল্প-সৌকর্যের দিকেই। সে-কারণেই বলেছিলেন, 'মুসলমান লেখকের সমস্ত রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিলেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গালা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে... তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁহার ভাষা ও ছন্দ।' (মোহিতলাল, ১৯৬৯: ২) বাংলা ভাষা যে কবি নজরুলের প্রাণের ভাষা, সেটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই মোহিতলাল মজুমদার জানিয়েছিলেন, 'আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গালার সারস্বত-মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যমোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক-সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি।' (মোহিতলাল, ১৯৬৯: ২) একজন সমালোচকের কর্তব্য বিষয়ে মোহিতলাল কতটা সচেতন ছিলেন, এ চিঠির মধ্য দিয়েই সেটির একটি বিশিষ্ট নমুনা আমরা দেখি। নজরুলের কবিতা কেন তাঁকে এ 'সুখের কর্তব্য সম্পাদনে' প্ররোচিত করেছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোহিতলাল জানিয়েছিলেন, 'কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গালা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে।... কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃ-উৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী।' (মোহিতলাল, ১৯৬৯: ৩) তিনি শুধু এখানেই থামেননি, আপন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিষয়ে রক্ষণশীল অবস্থানে থেকেও মোহিতলাল মজুমদার সমালোচনা সাহিত্যে যে-উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটি বুঝতে পারা যায়, যখন দেখি উদাহরণ হিসেবে তিনি নজরুলের 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতাটিকেই বেছে নেন। মোহিতলালের মতে, "খেয়া-পারের তরণী' শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি

করিয়াছে; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে – কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই – এই প্রকৃত কবি-শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে।'

মোহিতলাল তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে কবিতাটি থেকে উদাহরণ দিতেও কার্পণ্য করেননি। তিনি বলেছেন, "কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগতভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি ভীষণ গম্ভীর অতি-প্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দ-ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব –

আবুবকর উসমান উমর আলী-হাইদর (য)
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারিগান – 'লা শরীক আল্লাহ্!"

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে; বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য – 'লা শরীক আল্লাহ্' – যেমন মিল তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য-যোজনা বাঙ্গালা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে!' (মোহিতলাল, ১৯৬৯: ৪)

বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান সমালোচক ও কবি হিসেবে মোহিতলাল মজুমদার বিশ্বাস করতেন যে, 'কাব্যের মধ্যে কবির যে সহৃদয়তার পরিচয় পাই, যে সহানুভূতিকে সত্য-কার কবি-ধর্ম বলিয়া বুঝি, তাহা লৌকিক হৃদয়াবৃত্তি নয়।' (মোহিতলাল, ২০০৬: ১০) সে-কারণেই 'কবিধর্ম' বলতে তিনি কবিত্বকেই বুঝিয়েছিলেন, যা সরাসরি একজন কবির সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। নজরুলের কাব্যে মোহিতলাল মজুমদার সেই সৃষ্টিশক্তিরই তাৎপর্যময় প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। সে-কারণেই মোহিতলাল মজুমদারের এ চিঠিতে 'নবীন কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিপ্রতিভার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আছে।' সেইসঙ্গে এটিও মনে রাখলে সুবিধা হয় যে, 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতাটি নজরুলের *অগ্নি-বীণা* কাব্যেরই অন্তর্ভূত। সে-কারণে এ সমালোচনাটিকে যদি অংশত সেই কাব্যেরই একটি সমালোচনা হিসেবে ধরা হয়, তাহলেও কোনোভাবেই সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘিত হয় না, সমালোচনার পরিধিকেও অগ্রাহ্য করা হয় না।

## প্রতিভাবান কবি আবার প্রতিভাবান বালক

মোহিতলালের পরে নজরুল-সমালোচনায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা। এ সমালোচনাকে কেন্দ্র করেও এর পক্ষে-বিপক্ষে নানা ধরনের অভিমত গড়ে উঠেছে আমাদের সাহিত্যে। বুদ্ধদেব তাঁর সম্পাদিত *কবিতা* পত্রিকায় যে-অল্প কয়েকজন কবিকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যার আয়োজন করেছিলেন, তাঁদেরই একজন নজরুল ইসলাম। কবিতার নজরুল সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ: ১৩৫১) যখন প্রকাশিত হয়েছে, নজরুল তখন অসুস্থ। তারপরও বলা দরকার যে, এ সংখ্যাটি আমাদের সাহিত্যের জগতে নতুন করে পাঠকের সামনে নজরুলকে তুলে ধরেছিল। বুদ্ধদেব বসু ছাড়াও এ সংখ্যায় আরো যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – জীবনানন্দ দাশ ('নজরুলের কবিতা'), লীলাময় রায় ('নজরুল ইসলাম'), শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ('নজরুল'), সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ('আমাদের নজরুল') প্রমুখ।

তাঁর 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধের শুরুতেই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "কৃচিৎ এমন ঘটনাও দেশে ঘটে, যার ধাক্কায় স্তিমিততম মফস্বলও থরথর করে কেঁপে জেগে ওঠে। গান্ধিজির প্রথম অসহযোগ আন্দোলন তেমনি একটি ঘটনা।... ঠিক এই উন্মাদনারই সুর নিয়ে এই সময় নজরুল ইসলামের কবিতা প্রথম আমার কাছে এলো। 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে – মনে হলো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগে অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তা-ই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।" (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৪৫) শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতাটিই নয়, বুদ্ধদেব বসু তাঁর আলোচনায় নজরুলের 'প্রলয়োল্লাস', 'কামাল পাশা', 'কোরবানি' কবিতাটির সূত্র ধরেই নিজের স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে, 'নোয়াখালির রাক্ষসী নদীর আগাছা-কণ্টকিত কর্দমাক্ত নদীতীরে বসে (কলকাতা-ফেরত এক মুসলমান যুবকের কাছে পাওয়া বাঁধানো খাতা) সেই খাতাখানা আদ্যোপান্ত পড়ে ফেললুম।... সে-সব কবিতা অচিরেই ছাপার অক্ষরে দেখা যেতে লাগলো, তাদের দুরন্ত অভিনবত্ব আমাদের প্রশংসা করবার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলে।' নিজের আবেগ-যুক্তি আর ভাষার মাধুর্য দিয়ে সমালোচনার এ রীতি যে একান্তভাবেই বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব, সেটি বুঝতে বেগ পেতে হয় না। বুদ্ধদেব বসু আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে জানিয়েছিলেন, 'তাঁর (নজরুল) নিখাদ-নির্ঘোষ আমাদের মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলে ফিরতে লাগলো:

তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।

নূতনের কেতন সত্যি উড়লো। নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হলেন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে অন্য-কোনো কবি বিখ্যাত বিখ্যাত হননি।' (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৪৫-৪৬) মোহিতলাল মজুমদারের বেলায় আমরা যে-বিষয়টি বলেছিলাম,

সেটিও বুদ্ধদেবের বেলায় দেখতে পাই – ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে তিনি নজরুলের যেসব কবিতার উল্লেখ আর উদ্ধৃতি করেছেন, তার বেশিরভাগই দেখবো *অগ্নি-বীণা* কাব্যের, যা কিনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯ বঙ্গাব্দে!

নজরুলের কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নজরুলের কবি-ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করতেও বুদ্ধদেব বসু কোনোরকম দ্বিধা করেননি। তিনি বলেছিলেন, 'বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড়ো কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামের। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন তখন সত্যেন্দ্র দত্ত তাঁর খ্যাতির চরম চূড়ায় অধিষ্ঠিত, তাঁর প্রভাব সে-সময়টায় বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।' (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৪৯) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে নজরুলের পার্থক্য তুলে ধরতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, 'নজরুলের রচনায় সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিলো না তা নয় – কেনই বা না থাকবে – কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি তাঁর স্বকীয়তা সুস্পষ্ট এবং প্রবলভাবে ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলাদেশ তাঁকে গ্রহণ করলে, স্বীকার করলে – তাঁর বই রাজ-রোষ এবং প্রজানুরাগ লাভ করে এডিশনের পর এডিশন কাটতে লাগলো – অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করলেন তিনি। এটা কবির পক্ষে বিরল ভাগ্যের কথা।' (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৪৯) নজরুলের এ ভাগ্যটা যে ঠিক কপাল গুণে কুড়িয়ে পাওয়া নয়, সে-বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বেশ স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন, 'নজরুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলবার কথা এইটেই যে তিনি একইসঙ্গে লোকপ্রিয় কবি এবং ভালো কবি – তার পরে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, এ-সমন্বয় দুর্লভ, কারণ সাধারণত দেখা যায় যে বাজে লেখাই সঙ্গে-সঙ্গে সর্বসাধারণের হাত তালি পায়, ভালো লেখার ভালোত্ব উপলব্ধি করতে সময় লাগে।' (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৪৯)

কাব্যরচনায় নজরুলের কৃতিত্ব ঠিক কোথায়, সেটি দেখাতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ – এবং প্রধান দোষ। পড়েই বোঝা যায় যে যা-কিছু তিনি লিখেছেন, হু-হু করে লিখেছেন; ভাবতে বুঝতে মাজা-ঘষা করতে করতে কখনো থামেননি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি।' আবার এরইসঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন, 'এই ক্ষমতা চমকপ্রদ কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। এ-দিক থেকে বায়রনের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য ধরা পড়ে – সেই কাঁচা, কড়া, উদ্দাম-শক্তি, সেই চিন্তাহীন অনর্গলতা, কাব্যের কলকব্জার উপর সেই সহজ নিশ্চিত দখল, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, আতিশয্য, শৈথিল্য, সেই রসের ক্ষীণতা, রূপের হীনতা, রুচির স্খলন। গ্যোয়টে বায়রন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও সে-কথা সত্য: 'The moment he thinks, he is a child.' (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৫০) একেরমানকে (Johann Peter *Eckermann*: 1792-1854) দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিশ্বকবি গ্যোয়েটে (Johann Wolfgang von Goethe: 1749-1832) আদতে কী বলেছিলেন? কবি বায়রন সম্পর্কে গ্যোয়েটে বলেছিলেন, 'He is a great talent, a born talent, and I

never saw the true poetical greater in any man.' (*Eckermann,1951: 89)* বুদ্ধদেব যেটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটিও গ্যোয়েটে বলেছিলেন। কিন্তু তার পরের বাক্যগুলো কিন্তু বুদ্ধদেব আর উল্লেখ করেননি। যদি করতেন, তাহলে গ্যোয়েটের কথাটির পূর্ণাঙ্গ চেহারা আমরা দেখতে পেতাম, বুঝতে পারতাম। গ্যোয়েটে বলেছিলেন, 'Lord Byron only great as a poet; as soon as he reflects, he is a child.' কেন শিশু বলেছিলেন? তার কারণ হচ্ছে, বায়রন সম্পর্কে গ্যোয়েটে মনে করতেন, 'He knows not how to help himself against stupid attacks of the same kind made upon him by his own countrymen.' (*Eckermann, 1951: 82)* অথচ আমরা দেখি যে গ্যোয়েটের মিথ্যে দোহাই পেড়ে বুদ্ধদেব কিনা বায়রনের মতো নজরুলকেও 'প্রতিভাবান বালকের' সঙ্গে মিথ্যেমিথ্যি তুলনা করে গেলেন। (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৫০) আবারো এ-ও তো ঠিক যে, সেই একই প্রবন্ধের উপসংহারে এসে সেই বুদ্ধদেবই বলেছিলেন, "বিদ্রোহী' কবি, 'সাম্যবাদী' কবি কিংবা 'সর্বহারা'র কবি হিসেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানিনে, কিন্তু কালের কণ্ঠে গানের মালা তিনি পরিয়ে দিয়েছেন, সে-মালা ছোটো কিন্তু অক্ষয়। আর কবিতাতেও তাঁর আসন নিঃসংশয়, কেননা কবিতায় তাঁর আছে শক্তি, আছে স্বাচ্ছন্দ্য, আছে সচ্ছলতা, আর এগুলিই কবিতার আদিগুণ।" (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৫২)

**নজরুলের কবিতা এক টুকরো সবুজ জমি**

শুধুই প্রবন্ধেই নয়, *কবিতা*র নজরুল সংখ্যার সম্পাদকীয়তে (কার্তিক-পৌষ: ১৩৫১) বুদ্ধদেব খানিকটা আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, 'আজকাল যে-সব রচনা রাজনৈতিক কবিতা বলে আমাদের কাছে ধরা হয়, তার ধূসর নীরবতার সঙ্গে নজরুলের উদ্দীপ্ত আনন্দের প্রতিতুলনা সহজেই মনে জাগে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরে একজনকেও দেখলাম না রাজনীতির প্রেরণা থেকে একটি কবিতা লিখতে।' আর এরই সূত্রে তিনি জানিয়েছিলেন, 'আজকাল যে-সাম্যের বাণী লোকের মুখে-মুখে বুলিতে পরিণত হয়েছে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলই তাঁর প্রথম উদ্গাতা। রাজনীতিকে তিনি এড়িয়ে চলেননি, তার মধ্যে নিজেকে হারিয়েও ফেলেননি – তা থেকে বের করেছেন সুর-ঝংকার, এবং সেটাই তো কবির কাজ।' আর সেই কারণেই নজরুলের প্রতি বুদ্ধদেবের যত অনুরাগ, সেটি প্রকাশ করতেও তিনি কোনোরকমের দ্বিধা করেননি। তাঁর মতে, "এখনকার রাজনৈতিক আড্ডায় শুধু এইজন্যই তাঁর সম্মান হতে পারতো, সেটা হয়নি এই কারণে যে প্রগতিশীল পরিভাষায় নজরুলের কবিতা 'রোমান্টিক'।" বলা যায়, অনেকটা সরাসরি নজরুলের পক্ষ নিয়ে সমালোচক বুদ্ধদেব বসু প্রচণ্ড রকমের আত্মবিশ্বাস নিয়ে সেদিন বলেছিলেন, "বিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা – এ-সমস্ত জিনিসকে যাঁরা 'রোমান্টিক' বলে একপাশে সরিয়ে রাখেন, তাঁদের পক্ষে সাহিত্যচর্চা নিতান্তই অবৈধ।" (মীনাক্ষী, ১৩৯৫: ৭৪)

*কবিতা*র নজরুল সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধে যা কিছু বলেছিলেন, তার প্রায় সবই তিনি অনুবৃত্তি করলেন *An Acre of Green Grass* গ্রন্থে। সেখানেও তিনি বললেন, 'The

seed of satyendranath datta became active in Nazrul Islam, who, like him, performed the unusual feat of being nothing but a writer of verse and at the same time widely read.' বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'The reason for this popularity, in the case of the first, are topicality, lilting measures and a comfortable explictness that makes no demand on the reader's mental faculties.' আর সেই কথার সূত্র ধরেই তিনি আগের মতানুসারেই বলেছিলেন, 'Nazrul Islam has all these, and something more: an orator-like loudness which contrasts exquisitely with the sinuous whisperings of Jibanananda. These qualities, with different sets of modifications, re-appear in Premendra Mitra and, after an interval of about twenty years, in Subhas Mukhopadhyay.' (Buddhadeva, 1982: 59)

পরবর্তী সময়ে, ১৯৫২ সালে রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'তাঁর (নজরুল) রচনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই।' এ প্রসঙ্গ টেনে বুদ্ধদেব আরো বলেছিলেন, 'নজরুলের কবিতাও অসংযত, অসংবৃত, প্রগল্‌ভ; তাতে পরিণতির দিকে প্রবণতা নেই।' আবার এতকিছুর পরেও বুদ্ধদেব বসু সহজ ভাষায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন, 'নজরুলের দোষগুলি সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমস্ত দোষ ছাপিয়ে ওঠে; সব সত্ত্বেও এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি।' (বুদ্ধদেব, ১৩৬১: ১৪৫)

## নজরুল কেন বড় কবি: এক

বুদ্ধদেব বসুর পরে আমরা যে-মেধাবী সমালোচকের কাছ থেকে ধারাবাহিকভাবে অখণ্ড নজরুলের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা পেয়েছি, তিনি হলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। এতটা বিস্তৃত পরিসরে আর কেউই নজরুলের সাহিত্যিক-কৃতিত্বের রহস্য উন্মোচনে সেইভাবে এগিয়ে আসেননি।

মান্নান সৈয়দের সমালোচনার একটা বড় অংশকে আমরা বলতে পারি প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। যথাযথভাবে বলা হলে এটিকে বলা যায়, পূর্ববর্তী সমালোচকদের বক্তব্যের একটি প্রত্যুত্তর। যেমন মান্নান সৈয়দ যখন বলেন, 'বিবর্তনহীন? পরিণতিরিক্ত? প্রতিভাবান বালক? নজরুল-প্রাসঙ্গিক এইসব উক্তির একটি কারণ নজরুল-সমকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনঘোর উপস্থিতি। নানারকম চেতনাপ্রসারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের বিস্তর সাযুজ্য থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। নজরুলকে সর্বাংশে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ ও সমান্তরাল মনে করলে ভুল করব আমরা; কিন্তু ও-রকম তুলনামূলকতার এ-রকম বদভ্যাস তৈরি করেছি আমরা, যে, হয় নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিশেবে দাঁড় করাতে চেষ্টা করি, অথবা তাঁকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিই। কিন্তু রবীন্দ্রোচিত বিবর্তন – বাংলা কাব্যেতিহাসে – আর কই?' (আবদুল মান্নান, মার্চ ২০১৬: ৩৫) আমাদের তখন বুঝতে দেরি হয় না যে, নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু যে 'প্রতিভাবান বালকের' কথা বলেছিলেন,

এটি তারই প্রতিক্রিয়ায় রচিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ আরো বলেছিলেন, 'একা নজরুল কেন; মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ – যাঁরা রবীন্দ্রবিধর্মী কবি, তাঁদের কারো মধ্যেই কি বর্তমান? এমনকি উত্তরকালীন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কি জীবনভর খুব-বেশি বিবর্তিত হয়েছেন?' (আবদুল মান্নান, ২০১৬: ৩৫) এরই বিস্তারে গিয়ে নিজের কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মান্নান সৈয়দ এ-ও জানিয়েছিলেন, 'বস্তুত রবীন্দ্রসমকালে বা অব্যবহিত পরে কবিশিল্পীদের এ-ই ছিল প্রায় বিধিলিপি: তাঁদের চাষ করতে হয়েছে আলাদা ছোট খেতে; রবীন্দ্রোত্তর ক্রমাগত ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তর ভ্রমণ ভ্রমণ তাঁদের পক্ষে ছিল অসম্ভব – তাঁদের ব্যক্তিপ্রতিভার কারণে যেমন, তেম্নি সেই বিশেষ সময়ের চাপেও। যে-ছোট খেতটিতে তাঁরা চাষবাস করেছিলেন, সেখানে তাঁরা সফল।' (আবদুল মান্নান, ২০১৬: ৩৫) তারপরই আবদুল মান্নান সৈয়দ যৌক্তিকভাবেই প্রশ্ন রেখেছেন, 'একা নজরুলের উপর সব অপরাধ অর্শানো হয় কেন? এর একমাত্র জবাব কি এই হতে পারে, যে, শক্তিতে ও সম্ভাবনায় তিনি আর সবাইকে অতিক্রম করে যান – মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-কে?' (আবদুল মান্নান, ২০১৬: ৩৫) সাহিত্যের একটি চিরন্তন সমস্যাকে সামনে টেনে এনে মান্নান সৈয়দ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বলেছেন, 'সাহিত্যে এরকম বিচার বা সমাধান অত্যন্ত কঠিন বটে, হয়তো অপ্রয়োজনীয়-ও; তবু অজস্র স্খলন-পতন-ত্রুটি সত্ত্বেও, সম্ভবত, এঁদের মধ্যে প্রতিভাশক্তিতে নজরুলই সর্বাধিক অপরিমেয়: এ-রকম উক্তিতে লুব্ধ হই আমরা।' (আবদুল মান্নান, ২০১৬: ৩৫)

## নজরুল কেন বড় কবি: দুই

নিজের কথাগুলোর একটা শৈল্পিক ভিত্তি দেবার সক্রিয়তা থেকেই আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন, 'পরিণতির অপর দিকটিও প্রসঙ্গত বিবেচ্য। বলা হয়ে থাকে যে নজরুলের কবিতার মধ্যে অন্তর্গত পরিণতি দুর্লভ। এই কথাটিও খুব সতর্কভাবে বিচার্য। নজরুল যে-ধরনের কবি, তাতে, তাঁর পক্ষে তথাকথিত নিটোলতা-নিবিড়তাই কি প্রয়োজনীয়?' সেইসঙ্গে তিনি এই প্রয়োজনীয় কথাটিও বলতে ভোলেননি যে, 'প্রত্যেকটি শিল্পকাজের আলাদা ও নিজস্ব একটি মানদণ্ড আছে শিল্পের সামান্য শর্তাদির পরে: এই তথ্যটি তো বিস্মৃত হওয়া অনুচিত।' কেননা, মান্নান সৈয়দের মতে, "এরই অভাবে এ-রকম মন্তব্য আমাদের শুনতে হয়, যে, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সংক্ষিপ্ততর হতে পারত, অথবা এরকম ঢালাও বক্তব্য, যে, নজরুলের শিল্পশাসন অবর্তমান।" এখানেই থামেননি মান্নান সৈয়দ। তিনি তাঁর বক্তব্যের জের টেনে বলেছিলেন, 'যে-কোনো মানুষের মতন লেখকও কোনো সরল জীব নন। কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে প্রথমেই এক কুৎসা উৎসাদন করা উচিত যে তিনি একজন সরল লেখক ও কবি।' (আবদুল মান্নান, ২০১৬: ৩৫) মান্নান সৈয়দের মতে, 'নজরুল ইসলাম একজন জটিল ও আত্মবৈপরীত্যময় লেখকশিল্পী। মাত্র

২৪-বছরের (১৯১৯-১৯৪২) সাহিত্যসাধনায় তিনি যে-বিপুল ও বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর স্তব্ধতার ৬০-বছর পরেও আমাদের দুই বাংলার একাডেমি-ইনস্টিটিউট-ব্যক্তিগত উদ্যোগ তা নিঃশেষে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর মধ্যে কবির সুস্থাবস্থায় অন্ততপক্ষে তাঁর ৫০টি বই বেরিয়েছে এবং তার মধ্যে আছে কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, গান, গীতিনাট্য, কাব্যানুবাদ,স্বরলিপি, কিশোরসাহিত্য, পাঠ্য বই, প্রবন্ধ, সমালোচনা, অভিভাষণ ইত্যাদি।' (আবদুল মান্নান, জুন ২০১৬: ৩) মান্নান সৈয়দ তাঁর বক্তব্যের উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, 'স্তব্ধতা থেকে মৃত্যুকাল অবধি অন্ততপক্ষে তাঁর ৩০টি বই বেরিয়েছে।... সব মিলিয়ে এই ৮০-র অধিক বইয়ে এবং এখনো-অগ্রন্থিত আরো অনেক লেখায় যে-নজরুল ইসলামকে আমরা পাই তিনি বলিষ্ঠ বটে, নির্দ্বিধ বটে, কিন্তু সমস্ত-মিলিয়ে তাঁকে কিছুতেই সরল বলা চলে না, বলতে বাধ্য হই কূটাভাসময়।' (আবদুল মান্নান, জুন ২০১৬: ৩)

## নজরুল কেন বড় কবি: তিন

নজরুলের রচনাকর্ম বিষয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দের বিশ্লেষণ হচ্ছে, '১৯১৯ সালে নজরুল ইসলাম সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি চিরদিনের মতন নির্বাক হয়ে ও অসুস্থ হয়ে যান। সুতরাং ১৯১৯-৪২ এই ২৪ বছর নজরুলের শিল্পসাধনার কাল।' তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, 'এই ২৪ বছরের মধ্যে একটি বছরকে – ১৯২২ সালকে – আমরা মনে করি নজরুলের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছর। শুধু নজরুল-সাহিত্যের নয় – সমগ্র বাংলা সাহিত্যের জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ।' (আবদুল মান্নান, জুন ২০১৬: ৫) কেন গুরুত্বপূর্ণ? – তার কারণ দেখাতে গিয়ে মান্নান সৈয়দ একজন সাবালক সমালোচকের যাবতীয় দক্ষতা নিয়ে বলেছিলেন, "১৯২২ সালে নজরুল গ্রন্থকার হিশেবে আবির্ভূত হন – গল্পকার হিশেবে 'ব্যথার দান', কবি হিশেবে 'অগ্নি-বীণা' আর প্রবন্ধকার হিশেবে 'যুগবাণী'। এই ১৯২২ সালেই নজরুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা, বিংশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা, আবহমান বাংলা কবিতার একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা, 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয় – এবং নজরুলের নামের সঙ্গে চিরকালের মতন 'বিদ্রোহী কবি' কথাটি যুক্ত হয়ে যায়।" (আবদুল মান্নান, জুন ২০১৬: ৫) আমাদের সমালোচকদের মধ্যে কেউই, মান্নান সৈয়দের পূর্বে, এমন করে আবেগ-উত্তাপের শিল্পিত নিবিড়তা নিয়ে, ভাবনার সৌকর্যকে গুরুত্ব দিয়ে এভাবে নজরুলের রচনাকর্মের বিশ্লেষণ করেননি।

## শতবর্ষের *অগ্নি-বীণা* আমার

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা, যা কিনা *অগ্নি-বীণা* কাব্যের অন্তর্ভুক্ত, সেই কবিতা সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, "৮০-বছর আগে রচিত হলেও নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা আজো সমান জ্বলজ্বলে। ব্যক্তির উচ্চতার আকাঙ্ক্ষায় কবিতার শুরু আর শেষ

সমষ্টি ভাবনা-বেদনায়।" (আবদুল মান্নান, জুন ২০১৬: ৬) এ কবিতা সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দ আরো জানিয়েছিলেন, "বিদ্রোহী' যেমন নজরুলের খ্যাতিতম কবিতা, তেমনি বাংলা কাব্যেতিহাসের এক প্রোজ্জ্বল প্রাসাদ। এই কবিতার বিচারে এর রচনা ও প্রকাশের ইতিহাস, এর লোকপ্রিয়তা ও বিরুদ্ধতা, এর প্রকৃত মূল্যায়নের নানামুখী চেষ্টা, নজরুলের কবিতার অণুবিশ্ব রূপে এর অবস্থান, বাংলা কবিতার ইতিহাসে এর অভিনবত্ব – এই সমস্ত দিকই আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে।' সেইসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছিলেন, 'বেদনার সঙ্গে মনে রাখতে হবে: এই কবিতার পাণ্ডুলিপি, খুব সম্ভবত লুপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে – পাওয়া গেলে বিংশ শতাব্দীর একটি প্রধান কবিতার সৃষ্টিপদ্ধতির খানিকটা আঁচ পাওয়া যেতো।' (আবদুল মান্নান, ১৯৮৭: ৪৮)

আবদুল মান্নান সৈয়দই সম্ভবত প্রথম খেয়াল করলেন যে, "প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'বিদ্রোহী' এমনই বিখ্যাত হয় যে তা অচিরাৎ নজরুলের নামের আগে চিরকালের জন্যে যুক্ত হয়ে যায়। ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। মাত্র এক বছর পরে ১৭ জানুয়ারি ১৯২৩ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় শিরোনাম হয় 'বিদ্রোহী কবির কারাদণ্ড'। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বিদ্রোহী শব্দটি যে নজরুলের পূর্বে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়, তার প্রমাণ ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার এরকম বাক্য: 'গতকাল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের অভিনন্দন-উৎসব সোৎসাহে সম্পন্ন হইল'।" সেইসঙ্গে আবদুল মান্নান এ-ও খেয়াল করতে ভোলেননি যে "বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের ঠিক এক বছর পরে ৭ জানুয়ারি ১৯২৩ সালে তাঁর বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশিত হয়। দেখা যায়, তখনই তিনি (কাজী নজরুল ইসলাম) নিজেকে 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।... ১৯২৭ সালে ইবরাহিম খাঁর কাছে লেখা চিঠিতে, ১৯২৯ সালে এ্যালবার্ট হলের সংবর্ধনা-সভাতেও নিজেকে 'বিদ্রোহী' বলে উল্লেখ করেছিলেন।" (আবদুল মান্নান, ১৯৮৭: ৬১)

একইসঙ্গে এ কথাটিও এখানে বলতে হয় যে, আবদুল মান্নান সৈয়দ এ 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে 'নজরুল-মানসের চৈতন্যের পরমতা দেখতে পেয়েছিলেন।' তাঁর মতে, "বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে 'রেনেসাঁসী প্রমূল্যসমূহ তার সবগুলি পাপড়ি মেলেছিলো। ব্যক্তিসত্তার জয়গান পরিপূর্ণ উন্মোচনে ময়ূরের মতো চীৎকার করে উঠেছিলো। উনিশ শতাব্দীর বাংলা দেশেই জয়ী হয়েছিলো দেবত্বের উপর মানবত্বের সাধনার ধারা। মানবজাতির প্রবাহে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি মূল্যবান। এই বোধ মাইকেলের মতো রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলেও আর একবার তীব্র প্রজ্জ্বলিত।" শুধুই এটুকু বলেই তিনি থামেননি, বরং সমালোচনার তীব্র আসক্তির উপর ভর দিয়ে আরো বলেছিলেন, "আধুনিক বাংলা কবিতায় মাইকেলের 'সেই আমি' থেকে ব্যক্তিসত্তার যে-জয়গাথা শুরু হয়েছে, 'বিদ্রোহী'-র অসংখ্য আমি-র রেণুকণায় তা মিশে আছে। রেনেসাঁসী প্রমূল্যে ব্যক্তিবিকাশে যে-অমেয় আশাবাদ এই কবিতায় তা অবিরল স্পন্দিত হচ্ছে

প্রায় রেনেসাঁসী প্রমূল্যসমূহের হৃৎস্পন্দনের মতো।" (আবদুল মান্নান, ১৯৮৭: ৭১) কবিতাটির বিষয়ে সমালোচক আরো বলেছিলেন, "বিদ্রোহী'র কেন্দ্রনায়ক যে শিব, তার ধ্বংসশীলতা ও সৃজনশীলতা এই কবিতারও সারাৎসার। বস্তুত সম্পূর্ণ নজরুল-কাব্যেরই কেন্দ্র-কথা ঐ পুরনো ধ্বংস ও নতুনের উত্থান। নিজেকে নটরাজ, সাইক্লোন, ধ্বংস ইত্যাদি ঘোষণার পরেই নিজেকে তিনি আবার গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, চঞ্চল মেয়ের ভালোবাসা বলে অনুভব করেন। ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নতুন সৃজন বেদন – নজরুলই লিখেছিলেন অন্যত্র। এ তাঁর সমগ্র কাব্যের এবং 'বিদ্রোহী'রও মর্মবাণী।" তাঁর আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আবদুল মান্নান সৈয়দ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, "বিদ্রোহী' শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্পদ নয়, বিংশ শতাব্দীর সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতম।" (আবদুল মান্নান, ১৯৮৭: ৮৫) আবদুল মান্নান সৈয়দের কথার সূত্র ধরেই কাজী আবদুল ওদুদের কথা আমাদের মনে পড়ে। তিনি নজরুলের কবিকৃতির কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "বিদ্রোহী'তে তাঁর মানসিক কুয়াসা এতখানি কেটে যায় যে, তিনি যেন এক নতুন জীবন নিয়ে জেগে ওঠেন, নিজেকে ও জগৎকে দেখতে আরম্ভ করেন এক নতুন দৃষ্টিতে।' (কাজী আবদুল, ১৯৮৩: ৮২) নজরুল-সাহিত্যের যথাযথ পর্যালোচনার জন্যে কবির এ দেখার দৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করাটাও কখনো-কখনো জরুরি হয়ে ওঠে।

### শ্রদ্ধার পাশাপাশি শ্রাদ্ধ: এক

নজরুলের কবিতা নিয়ে এসব ইতিবাচক আলোচনার একটা উল্টোপিঠও রয়েছে। সেই বিষয়টিও আমাদের খানিকটা হলেও জানা দরকার। জানা দরকার একদিকে যেমন সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনে, অন্যদিকে নজরুল-সাহিত্যের সমালোচনার ইতিহাস বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য। তবে, এ ক্ষেত্রে এটুকু সাবধানতার প্রয়োজন যে সাহিত্যের বিপরীত মতটা যেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষে গিয়ে না-পৌঁছোয়। তাহলে সেটি আর সাহিত্যের পর্যায়ে থাকে না, একটা কদর্য আখ্যানে পরিণত হয়।

'আমি কেন লিখি?' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি গোলাম মোস্তফা বলেছিলেন, 'দেহের প্রয়োজনে ভাত খাই, আত্মার প্রয়োজনে লিখি।' তিনি এ-ও পর্যন্ত বলেছিলেন, 'আমার লেখার উদ্দেশ্য... যতটা না সত্য-প্রকাশ, ততটা আত্ম-প্রকাশ।' আর তাই সে-প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই তিনি আমাদের আরো জানিয়েছিলেন, 'আমার লেখায় তাই আমি প্রকাশিত হব, নানা বৈচিত্র্যে নানা রসে নানা ছন্দে নানা গানে আমি স্পন্দিত হব, নিখিল মনে আমাকে নিয়ে জাগবে বিস্ময়, জাগবে কৌতূহল, জাগবে নব নব জিজ্ঞাসা – এই বিপুল আত্মচেতনা ও অহমিকা থেকেই আমার সব লেখা উৎসারিত হয়।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬২: ১৭১) তিনি এ-ও বিশ্বাস করতেন যে, 'নিজের জন্য প্রত্যেকেই লেখে।' আর সে-কারণেই দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'লেখকের সঙ্গে তাই সমাজের

নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সমাজের কথা তাকে ভাবতে হয়। লেখকের ভাব ও চিন্তাধারা যদি সমাজ-মনে সংক্রমিত না হয়, বা নিখিল বিশ্বে তার ঠাঁই না মেলে, তবে সেও মরে যায়, তার সৃষ্টিও মরে যায়। এইজন্যেই তাকে সমাজ-সচেতন হতে হয়।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬২: ১৭২) একজন সাহিত্যিকের এ মনোভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রণোদিত করে। অথচ সেই গোলাম মোস্তফা যখন নজরুলের কাব্যের সমালোচনা করছেন, তখন তিনি তাঁর উপর্যুক্ত কথাকেই যেন নানাভাবে অস্বীকার করেছিলেন। গোলাম মোস্তফা নজরুলের কৃতিত্ব স্বীকার করেই প্রথমে বলেছেন, "নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা এক অদ্ভুত সৃষ্টি। বলিষ্ঠ পৌরুষব্যঞ্জক ভাবের যতো কবিতা এ যাবত বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছে, তন্মধ্যে 'বিদ্রোহী' নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়। এমন তেজস্বিনী ভাষা, বিপ্লবী ভাবধারা, শব্দ-সম্পদ, উপমা ও আবেদন খুব কম কবিতায় দেখা যায়।" (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ১৬০) শুধু এটুকুই নয়, আমরা দেখব, এমনকি কবি-দার্শনিক ইকবালের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেছিলেন, "ইকবালের মতে 'আমি আছি' এই কথা যে যতোখানি প্রতিপন্ন করতে পারবে, সে ততোখানি শক্তিমান। এই হিসাবে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।" এমনকি, তাঁর মতে, "বল বীর/বল উন্নত মম শির।' এর চেয়ে বলিষ্ঠ আত্ম-প্রতিষ্ঠার বাণী আর কি হতে পারে?' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ১৬১)

অন্যদিকে, খানিকটা অবাক হয়েই আমরা দেখতে পাই যে, সেই একই গোলাম মোস্তফা ওই প্রবন্ধের মধ্যেই বলেছেন, "ইকবাল যে খুদির প্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন, 'বিদ্রোহী' ঠিক সেই আদর্শের নয়।" মোস্তফার মতে, 'বিদ্রোহী' রচনার মূল প্রেরণা হচ্ছে, 'জ্ঞানের অহমিকা'। শুধু তা-ই নয়, গোলাম মোস্তফা তাঁর কথাকে সবিস্তারে বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় "প্রেমের কমনীয়তা এতে নেই। প্রেমহীন জ্ঞানের এই পরিণতি। অবশ্য কেউ বলতে পারেন: অন্যায় ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে আমাদের 'বিদ্রোহী' হতে হবে। কিন্তু সেখানেও বিদ্রোহের কথা আসে না।" কেন আসে না? তার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোলাম মোস্তফা মন্তব্য করেছিলেন, 'শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তো মানুষ হিসাবে কর্তব্য। বিদ্রোহের কোনো কথা নয়, তার সঙ্গে করতে হবে আমাদের জেহাদ। বিদ্রোহের কথা উঠলে তো মিতালীর কথা আগেই স্বীকার করা হয়ে যায়। কাজেই বিদ্রোহের কথা অবান্তর। ইসলামে তাই কোনো বিদ্রোহের কথা নেই, আছে দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা। বিদ্রোহ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধেও যেমন চলে না, শয়তানের বিরুদ্ধেও চলে না।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ১৬২) এভাবে সাহিত্যের আলোচনার গতিমুখকে তিনি ধর্মের আলোচনার দিকে ফিরিয়ে রাখলেন।

## শ্রদ্ধার পাশাপাশি শ্রাদ্ধ: দুই

অন্যসব সমালোচকের মতো গোলাম মোস্তফাও আমাদের জানাচ্ছেন, '*অগ্নি-বীণা*

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৩২৯ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে মোট ১২টি কবিতা আছে।... এর ভিতরে ৭টি ইসলামী ভাবাপন্ন, বাকী ৫টি ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ১৯১) তিনি একটি তালিকাও প্রণয়ন করে পাঠকদের জানিয়ে দেন যে, 'প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু।' – 'ভাবের দিক দিয়াও এইসব কবিতা অত্যন্ত অগভীর ও পশ্চাৎমুখীন। কাজেই অবশ্য বর্জনীয়' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ১৯৬) নজরুলের আরেকটি বিখ্যাত কবিতা 'ধূমকেতু'-কে গোলাম মোস্তফা 'বিদ্রোহী' কবিতার 'ছোট ভাই' হিসেবে উপহাস করেছেন। কেন ছোট ভাই? না, সেখানে নজরুল যে বলেছেন, 'আমি বসিব বলিয়া পেতেছে ভবানী ব্রহ্মার বুকে পিঁড়ি'! এরপরে, গোলাম মোস্তফা বলেছেন, নজরুলের'অবশিষ্ট কামাল পাশা, আনোয়ার, রণভেরী, শাতিল-আরব, খেয়াপারের তরণী, কোরবাণী ও মুহর্‌রম ইসলামী আদর্শে ও ধ্যান-ধারণায় অত্যুজ্জ্বল। কামাল পাশার মতো সামরিক ছন্দের কবিতা বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয়টি নাই। খেয়াপারের তরণীও ভাব-গাম্ভীর্যে অনবদ্য।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ১৯৬)

অন্যদিকে, নজরুলকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে তীব্রভাবে নারাজ ছিলেন গোলাম মোস্তফা। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, 'নজরুলকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু নজরুলের সবচেয়ে বড় অপবাদ যদি কিছু থাকে, তবে এই। নজরুল যা নন, তাঁর উপর তাই আরোপ করিলে তাঁকে হেয় করা হয়।' নজরুলের অপরাধ হচ্ছে এই যে, "পাকিস্তানের কবি হওয়া তো দূরের কথা, নজরুল ছিলেন ঘোর পাকিস্তান বিরোধী। তিনি গাহিয়াছিলেন 'অখণ্ড ভারতের' গান।" (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ২৫১)

**শ্রদ্ধার পাশাপাশি শ্রাদ্ধ: তিন**

নজরুলকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতে গোলাম মোস্তফা যে খানিকটা অস্বস্তিতে ভুগেছেন, সেটির প্রমাণ আমরা তাঁর লেখার মধ্যেই পাই। নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে তাই তাঁকে সেদিন 'নজরুল-কাব্যের অপর দিক' প্রবন্ধে বলতে হয়েছিল, 'পাকিস্তানের আলোকে ও ইসলামের আলোকে নজরুল-কাব্য পাঠ করতে হবে।' এতকিছুর পরেও তিনি নজরুলের কৃতিত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেননি। যে-কারণে বলেছেন, 'নজরুল ইসলাম এ যুগের একজন ক্ষণজন্মা প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অপরিসীম। বলিষ্ঠ প্রকাশ-ভঙ্গি দ্বারা, নব নব শব্দ-সম্পদ দ্বারা, মৌলিক চিন্তা ও ভাবধারা দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সত্যই তিনি সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সঙ্গীতেও তাঁর দান অনন্যসাধারণ। বস্তুত তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের কোনোই প্রশ্ন নাই।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ২৩৪) তাহলে নজরুলকে এভাবে দ্বিখণ্ডিত করা কেন? সম্ভবত নিজের বিবেক-দংশন থেকে রেহাই পেতেই অনেকটা কৈফিয়তের স্বরে গোলাম মোস্তফা সেদিন বলেছিলেন,

'ইসলামী দর্শন এবং পাকিস্তানের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের আলোকেই আমরা নজরুল কাব্যের বিচার করিয়াছি। আমরা আজ নূতন পথে জয়যাত্রা করিতেছি। প্রথমেই তাই আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শের নির্দেশ একান্ত প্রয়োজন। এইজন্যই আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই অপ্রীতিকর আলোচনায় হাত দিয়াছিলাম।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ২১৫) অনেকটা কাতর-কণ্ঠেই যেন গোলাম মোস্তফা সেদিন লিখেছিলেন, 'নজরুল আজ রোগ-শয্যায় শায়িত। এ অবস্থায় তাঁর কাব্যের বিরূপ সমালোচনা খুবই অশোভন হইল; সন্দেহ নাই।' তাঁর সেই আর্ত-ধ্বনি যেন এত বছর বাদেও আমাদের বুকে এসে বাজে। প্রশ্ন জাগে কোনো চাপের মুখে দাঁড়িয়ে, কোনো কর্তৃত্ববাদীর ইশারায় বাধ্য হয়ে, সেদিন তিনি সাহিত্য-সমালোচনার নামে নজরুলের প্রতি এমন বিরূপতা দেখিয়েছিলেন? তাঁর নিজের ভাষ্যমতে নজরুল সম্পর্কে 'যাহা কিছু বলিয়াছি, ইসলাম ও পাকিস্তানের কল্যাণ কামনাতেই বলিয়াছি।' (গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮: ২১৫)

**নজরুলের আদ্যশ্রাদ্ধ**

তাঁর কবিতায় জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, 'আমাদের এই শতকের/বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু – বেড়ে যায় শুধু;/তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়/জ্ঞান নেই আজ পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।' (জীবনানন্দ, ১৯৮৮: ১৩৮) কথাগুলো আবারো মনে পড়ে যখন আমরা হুমায়ুন আজাদের নজরুল-সমালোচনা পাঠ করি। সাহিত্য-বিচারে বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা করা সত্ত্বেও (বুদ্ধদেবের সমালোচনাকে আজাদ বলেছিলেন: 'মর্মভেদী রচনা'), কার্যত তাঁরই স্বভাবের বিপরীতে দাঁড়িয়ে হুমায়ুন আজাদ লেখেন, 'আমরা শৈশবের স্খলনপতনভরা কাব্যপ্রচেষ্টাতেই তিরিশমুখি হয়ে উঠি। ষাট-সত্তরের দশকে যে-তরুণ শব্দে আনন্দ আবিষ্কার করেছে, তার সামনে মোহ ছড়াতে পারেননি নজরুল। এমনকি এমন ঘটনাও অস্বাভাবিক নয় যে নজরুল নামী কোনো কবির অস্তিত্বই সে অনুভব করেনি, তাকে সারাক্ষণ ডেকেছে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে।' (হুমায়ুন, ১৯৯২: ৩৪) তাঁর আরেকটি লেখায় হুমায়ুন আজাদ অনেকটা বুদ্ধদেবকে একেবারে সরাসরি অনুকরণ করেই বলেছিলেন 'বাঙলা লেখকদের লেখা পড়ার সময় বিব্রত বোধ করি বারবার। আমাদের প্রধান লেখকদের মধ্যেও মৌলিকত্ব শোচনীয়রূপে কম, যখন তাঁরা চিন্তা করেন তখন তাঁরা অনেকটা শিশু।' (হুমায়ুন, ২০১১: ৪০) আজাদের এই 'বিব্রত' প্রবণতার প্রধান শিকার সম্ভবত কাজী নজরুল ইসলাম। কেননা, আজাদ জানিয়েছিলেন, 'তরুণ বয়স থেকেই অস্বস্তি বোধ করি আমি নজরুলের লেখা পড়ার সময়; তিনি মাঝারি লেখক বলে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত লেখক বলে। তিনি ভারী বোঝার মতো চেপে বসে আছেন বাঙালি মুসলমানের ওপর।' নজরুল-বিষয়ে তিনি নিজেও একসময় বিভ্রান্ত ছিলেন, এমনটাই যেন বলে উঠেছিলেন, 'প্রচারে প্রচারে তাঁকে আমি বিদ্রোহী বলেই মনে করেছি যখন বালক ছিলাম, বেশ কিছু গদ্যেপদ্যে দেখেছিও তাঁর বিদ্রোহীরূপ।' কিন্তু পরে গিয়ে তিনি যেন বুঝতে পেরেছিলেন যে আদতে নজরুল হচ্ছেন,

'বাঙলা ভাষার বিভ্রান্ত কুসংস্কার-উদ্দীপ্ত লেখকদের মধ্যে প্রধান।' (হুমায়ুন, ২০১১: ৪০) আমাদের মনে খেদ থেকে যায় এ কারণে যে, তাঁর বক্তব্যের পক্ষে নমুনা হিসেবে হুমায়ুন আজাদ এমন কোনো দৃষ্টান্ত দেখাননি, যাতে করে সেটিকে খানিকটা হলেও চিন্তার মধ্যে রাখা যায়। এর কারণ হচ্ছে, আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদের ধারণা মারাত্মকভাবে একমুখীন। তিনি এর বৈচিত্র্য, এর উপসর্গগুলো ঠিকভাবে বুঝতেন কিনা, সেই সন্দেহ খানিকটা রয়েই যায়। একজন কবির চেতনায় আধুনিকতার নানান লক্ষণের উপস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি মণীন্দ্র গুপ্ত আমাদের জানিয়েছিলেন, 'একজন প্রকৃত কবির চেতনায় জীবন ও পৃথিবী সবসময়েই অফুরান। প্রেমের কবিতার পরে অপ্রেমের কবিতা, উদাসীনতার কবিতা, শান্তির কবিতা, একাকীত্বের কবিতা, ভয়ের কবিতা, মৃত্যুর কবিতা আসতে পারে। নিজেকে ছাড়িয়ে আরো কত বিচিত্র কবিতা আসতে পারে।' (মণীন্দ্র, ২০২১: ১২৬) কবির চেতনায় জারিত এই বৈচিত্র্যটাই আধুনিকতার প্রধানতম লক্ষণ। অন্যদিকে, বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'একটি ভালো রচনা সমস্ত সমালোচনার সারাৎসার।' আর সেজন্যই তাঁর মনে হয়েছে, 'সমালোচনা ভালো-মন্দ বাছাই করতে শেখায়।' (বুদ্ধদেব, ১৯৮৪: ১৩৫) এর পাশাপাশি তিনি এটিও বলেছেন, 'সমালোচনার কাছে শেষ কথা যদি কখনো আশা করি, তাহলেই আমরা ভুল করবো। সাহিত্য বা শিল্পকলা এমন বিষয়, যা নিয়ে শেষ কথা কেউ কখনো বলতে পারেনি, বলতে পারে না।' (বুদ্ধদেব, ১৯৮৪: ১৩৮) তিনি একেবারে সুনির্দিষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন, 'যাকে exact science বলে, সমালোচনার প্রকৃতি ঠিক তার বিপরীত। এখানে সবই আপেক্ষিক, সবই আনুমানিক, সবই মোটামুটি কথা।' (বুদ্ধদেব, ১৯৮৪: ১৩৮) অন্যদিকে, হুমায়ুন আজাদ তাঁর সমালোচনায় যেন শতভাগ অনমনীয়, নির্ভীক। এ ধরনের সমালোচনাকে বুদ্ধদেব অনেক বছর আগেই খারিজ করে দিয়েছেন। সেইসঙ্গে এটিও বলবার যে, নজরুলের ইসলামী কবিতা, এমনকি কোনো গানের মধ্যেও হুমায়ুন আজাদ কোনো বিদ্রোহীকে পাননি, বরং পেয়েছেন 'একজন ইসলাম অন্ধ' ব্যক্তিকে (হুমায়ুন, ১৯৯২: ৪২)।

## সকলেই কবি নন, নজরুল কবি: এক

'কবি কে?' – এ প্রশ্নের উত্তরে খুবই সংক্ষেপে অথচ তাৎপর্যপূর্ণভাবে জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, 'কবি তো সেই মানুষই যিনি সত্যকে অনুভব করতে পারেন এবং ভাষার আবেগ-প্রদীপ্তির সাহায্যে আমাদের হৃদয়ের ভিতর পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। অর্থাৎ কবির সত্য হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করলাম।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ১২৬) নজরুলের কবিতা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ মনে রেখেছিলেন যে, 'কোনও এক যুগে মহৎ কবিতা বেশি লেখা হয় না।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ২০৩) তাঁর মনে হয়েছে, 'নজরুল ইসলাম-এর লেখায় মহাকবিতার গভীর প্রসাদ নেই, তাঁর প্রতিশ্রুতিও কম।' কিন্তু সেইসঙ্গে তিনিই আবার এমন প্রশ্ন উত্থাপন করতে দ্বিধা করেননি যে, 'কোনও এক যুগে ক'জনের কবিতায়ই-বা তা থাকে?' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ২১১) সম্ভবত এরই সূত্রে তিনি

বলেছিলেন, 'নজরুল-এর কবিতার এমন অনেক গুণ আছে, যে-সবের সঙ্গে আজকের বাংলা কবিতার একটা প্রধান প্রাণতরঙ্গ মোটেই সমধর্মী নয়। এক-কথায় বলতে পারা যায় যে, অনেক আধুনিক বাংলা কবিতারই মর্মবাণী ভেদ করা কঠিন, কিন্তু নজরুল-এর কবিতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়... নজরুল-এর কবিতায় অর্থসারল্য আছে, ওজস্‌ও রয়েছে এক হিসেবে।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ২১১) এটিই হচ্ছে সমালোচকের সেই 'নৈর্ব্যক্তিক গুণ', যার কথা নানাভাবে অমিয় চক্রবর্তী থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু দে বলে গিয়েছেন। সমালোচকের সেই শক্তির উপর ভর দিয়েই জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, 'কাব্যের সুর এক আশ্চর্য বৈদেহী পবিত্রতায় নিজের ধ্রুবলোকে পৌঁছেছে, ও-রকম দাবি নজরুল-এর কবিতা সম্পর্কে করা যায় না।... কাজীর কবিতা বিশেষ একটা মাত্রার দেশে তার অতীতের ভিতরে পরিসমাপ্ত।... কিন্তু তবুও এই শতাব্দীর এই দশকেও আমাদের দেশে কাজী নজরুল-এর কবিতার জন্যে সাধারণ পাঠক যে-আকর্ষণ বোধ করেন, অন্য কারও কবিতার জন্যে তা করেন কি-না সন্দেহ।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ২১১-২১২) নিজের কথাকে একটা যৌক্তিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে *শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়* (১৩৫৪) জীবনানন্দ বলেছিলেন, 'বাংলার এ-মাটির থেকে জেগে, এ-মৃত্তিকাকে সত্যিই ভালোবেসে আমাদের দেশে ঊনিশ শতকের ইতিহাসপ্রান্তিক শেষ নিঃসংশয়তাবাদী কবি নজরুল ইসলাম তাঁর জনপ্রেম দেশপ্রেম পূর্বোক্ত শতাব্দীর বৃহৎ ধারার সঙ্গে সত্যিই একাত্ম। পরবর্তী কবিরা এ-সৌভাগ্য থেকে অনেকটা বঞ্চিত বলে আজ পর্যন্ত নজরুলকেই সত্যিকারের দেশের ও দেশীয়দের বন্ধু কবি বলে জনসাধারণ চিনে নেবে। জনের ও জনতার বন্ধু ও দেশপ্রেমিক কবি নজরুল।' (জীবনানন্দ, ২০০৯: ২১৫)

## সকলেই কবি নন, নজরুল কবি: দুই

কবি গোলাম মোস্তফা বা কবি-প্রাবন্ধিক হুমায়ুন আজাদের মতো সমালোচকদের কথা বিবেচনায় রেখেই আবু সয়ীদ আইয়ুবকে আবারও স্মরণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। 'রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী কাব্যধারা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আইয়ুব বলেছিলেন, 'রবীন্দ্র-পরবর্তীদের মধ্যে জনগণের কবি প্রকৃতপক্ষে নজরুল ইসলামকেই বলা চলে। জনগণের নাড়ী কোনখান দিয়ে বয়, সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অব্যর্থ।' (আইয়ুব, ২০২২: ৪৬৪) আইয়ুব এ-ও বলেছেন যে, 'সাহিত্যকে যদি জীবনের সমালোচনা বলা হয়, তা হলে নজরুল ইসলাম বড় সাহিত্যিক বলে গণ্য হতে পারেন না।' এটি বলার পরেও নজরুল-সাহিত্যের আরেকটি প্রবণতার দিকে দৃষ্টিপাত করে আইয়ুব জানিয়েছিলেন, 'সাহিত্যিক তো শুধু সমালোচক নয়, সমাজের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির সে প্রতিফলকও বটে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আধুনিক বাংলা কাব্যে নজরুলের তুলনা নেই।' আর এরপরই আইয়ুব সিদ্ধান্ত টানেন এই বলে যে, 'বাংলার বুকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিদ্রোহের যে-আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই আগুনের স্পর্শে তাঁর বীণা হল অগ্নিবীণা। জাতীয় বিপ্লবের তিনিই সার্থক সাহিত্যিক প্রতিভূ।' (আইয়ুব, ২০২২: ৪৬৪) আবার

এ বিশ্লেষণের খানিকটা কাছাকাছি এসে, শিল্প-সাহিত্যের মৌলিক তাৎপর্যের একটা সন্ধান দিতে গিয়ে অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক সৈয়দ আকরম হোসেন বলেছেন, 'যে-কোন শিল্পস্রষ্টার অন্তর্গত ব্যাকরণ হলো তাঁর আবেগ-স্পন্দিত চেতনা; এবং সে-চেতনাপুঞ্জ বিদ্যুৎশক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপরিবর্তী ও তলবর্তী শক্তিপ্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে, আকর্ষণে-বিকর্ষণে। বিদ্যুৎপূর্ণ প্রজ্বলন্ত প্রতিভা কখনোই অবলম্বহীন দোদুল্যমান নয়; মূলত সে অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় কারণে দ্রুত চেতনা থেকে অবচেতনায় এবং অচেতনায় সঞ্চরণ ছিল।' (সৈয়দ আকরম, ১৯৮৫: ৬৭) সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে কথাগুলো মনে রাখা জরুরি। যে-কারণে এরই ভিত্তিতে, হুমায়ুন আজাদের একেবারে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক সৈয়দ আকরম হোসেন বলেছেন, 'কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভান-শক্তির উৎসবিন্দু কিংবা সংবেদন-বলয়ের পরিসীমা বিন্দুসংহত-অভিজ্ঞতায় সংস্থিত নয়, মূলত অভিজ্ঞতা-বিশেষিত হৃদয়াবেগে শিল্পদীক্ষিত। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু-মধ্যবিত্তের ক্রম-অপসৃয়মান, ভগ্নপক্ষ, নৈরাশ্যময় ও চূর্ণস্বপ্ন সমাজচেতনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে নবজাগ্রত বাঙালি মুসলমান-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনাস্পর্শী নজরুল ছিলেন মূলত তারুণ্যশাণিত, আবেগে-সংরাগে উচ্চকিত, জীবনার্থে স্বপ্নময় ভবিষ্যতে বিশ্বাসী, অস্তিত্ব-বিস্তারে সীমাহীন, রোমান্টিক অনুভবে প্রেম-সৌন্দর্য-মুগ্ধ এবং অচরিতার্থতা ও ব্যর্থতায় ছিলেন প্রতিবাদী, বিদ্রোহী।' (সৈয়দ আকরম, ১৯৮৫: ৬৭) বুদ্ধদেব বসুর মতো সৈয়দ আকরম হোসেনও নজরুলকে রোমান্টিক কবি হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, 'তাঁর কবিস্বভাব রোমান্টিকতার বিচিত্র উপাদানে সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিপুষ্টি লাভ করেছে। নজরুলের প্রেমসংক্রান্তচেতনা, রহস্যবোধ; প্রকৃতির বিচিত্রতায় আত্ম-অনুভূতির সঞ্চারণ; আবেগের তীব্রতা; অনুভূতির তীক্ষ্ণতা; চিত্রসৃষ্টিতে আতিশয্য; ফর্মের প্রতি অমনোযোগ; সমগ্র কবিতার মধ্যে অংশ-বিশেষের শিল্প-সার্থকতা এমনকি তাঁর বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ রোমান্টিক মানসিকতা-জাত।' (সৈয়দ আকরম, ১৯৮৫: ৮১) নজরুলের বিশ্বাসপ্রবণতাকে পাঠকের সামনে এনে সৈয়দ আকরম হোসেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন, "নজরুলই একমাত্র যিনি সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক। তিনি ভারতীয় মিথ, এশিয় মিথ, (যাকে লোকে মুসলিম মিথ বলে, আমি বলি না। আমি বলি পশ্চিম এশিয় মিথ।) এগুলোকে তিনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তা অন্য কেউ করেননি। একটি বাক্য, ডুবে যাচ্ছে কে সে? 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন। কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।' এই নজরুলের আকাশচুম্বি অসাম্প্রদায়িকতার বিশালতা এবং সর্বমিথকে আত্মীকৃত করে যে সাহস, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ – এই জিনিসটি কিন্তু আর কারো মাঝে নেই।" (সৈয়দ আকরম, ২০২২: ২৪) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অহেতুক তুলনা টেনে নয়, বরং নজরুলের কৃতিত্বটাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ তো রবীন্দ্রনাথ। তিনি একেবারেই আলাদা। আমি বলছি, পরবর্তীকালে সক্রিয় যে ব্যক্তিটি তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। এরকম স্পষ্ট করে বলেননি কেউ। কিন্তু আমাদের এখানে নজরুলের

গানের চর্চাই হয়েছে। নজরুলের যে বোধের চর্চা, মেধার চর্চা, আবেগের চর্চা, তাঁর যে অসাম্প্রদায়িক চর্চা, এই চর্চার প্রান্তগুলো কিন্তু ওইভাবে উন্মোচিত হয়নি।' নজরুল সম্পর্কে সৈয়দ আকরম হোসেন তাঁর সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে বলেন, 'কাজী নজরুল ইসলামকে যদি আমাদের ভারতীয় আদর্শের মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করা হতো, তাহলে আমাদের ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হতো।' (সৈয়দ আকরম, ২০২২: ২৪) শুধুই রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, আমাদের সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, আমাদের সমালোচনার ধরনটাও খানিকটা ভিন্ন হতো, আজকের মতো এতটা অসহনশীল আর অযৌক্তিক যে হতো না, সেটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

## জীবন্ত কবি নজরুল

এ ইতিহাস অনেকেরই জানা আছে যে, ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার এলবার্ট হলে সওগাত-পরিকল্পিত এক নজরুল-গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন – জলধর সেন, সুভাষচন্দ্র বসু, অপূর্বকুমার চন্দ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, এস ওয়াজেদ আলী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। (অরুণকুমার, ২০১৭: ৪২১) সে অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'আজ বাংলার কবিকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।... নজরুল কবি – প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি; তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন। আজ আমি এই ভেবে বিপুল আনন্দ অনুভব করছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাংলার কবি, বাঙালির কবি!... কবিরা সাধারণত কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তা নন। কারাগারের শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন তা বাঙালির প্রাণে এক নতুন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।' (অরুণকুমার, ২০১৭: ৪২২)

ওই গণ-সংবর্ধনায় রাজনীতিবিদ সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'স্বাধীন দেশে জীবনের সহিত সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নাই। দেশ পরাধীন বলে এদেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুলে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানাদিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন।... এতেই বুঝা যায় যে নজরুল একটা জীবন্ত মানুষ।' (অরুণকুমার, ২০১৭: ৪২৪) নজরুলকে জীবন্ত মানুষ আখ্যা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, সেইসঙ্গে এ কথাগুলোও বলেছিলেন, 'কারাগারে আমরা অনেকে যাই; কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ।' কাজী নজরুল ইসলামকে তিনিও 'বিদ্রোহী

কবি' হিসেবে স্বীকার করে জানিয়েছিলেন, 'নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয় – এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব – তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব তখনও তাঁর গান গাইব।' (অরুণকুমার, ২০১৭: ৪২৪)

## উত্তেজনাময় কিন্তু শৃঙ্খলাপূর্ণ কাজ

মানুষের চিন্তাধারার পদ্ধতি ও সেইসঙ্গে তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কমরেড মাও সে-তুঙ বলেছিলেন, 'আমাদের প্রয়োজন হলো উৎসাহী কিন্তু স্থিরচিত্ত মনোবৃত্তির, উত্তেজনাময় কিন্তু শৃঙ্খলাপূর্ণ কাজের।' নজরুলের কাব্য, বিশেষভাবে তাঁর *অগ্নি-বীণা* যেন মাওয়ের এ কথার শৈল্পিক উপস্থাপনায় প্রতিভাসিত। আর সেইসূত্রে বদরুদ্দীন উমরের কথাটি আবারও আমাদের স্মরণ করতে হয় যে, 'আজ প্রয়োজন সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এই নজরুলপ্রীতি ও নজরুল-সাহিত্যচর্চার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা।... তার জন্যে প্রয়োজন নজরুল-সাহিত্যের, নজরুল-সঙ্গীতের এবং নজরুল-জীবনের সত্যিকার চিত্র জনসাধারণ ও সংস্কৃতিকর্মীদের সামনে উপস্থিত করা।' আর, 'এভাবেই সৃষ্টি করতে হবে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সুস্থ চেতনার, যে-চেতনা সক্ষম হবে আমাদের সামগ্রিক জীবনকে সুন্দর ও শোষণমুক্ত করতে।' (বদরুদ্দীন, ২০০৪: ৪৪) যুদ্ধের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া নয়, বরং, 'পরিমিত টানে' স্রোতের বিপরীতে সাঁতরিয়ে তীরে পৌঁছানোকে কমরেড মাও সে-তুঙ গুরুত্ব দিয়েছিলেন (মাও, ১৯৭৯: ৫৮)। নজরুলের *অগ্নি-বীণা*র কবিতাগুলো এক অর্থে কমরেড মাওয়ের সেই বক্তব্যেরই শৈল্পিক তাৎপর্যে প্রকাশিত। একজন আত্মসচেতন কবির কাব্যকর্ম শেষ পর্যন্ত তো তা-ই, তা সেইভাবেই বিকশিত হয়।

## শেষ নাহি যে

নজরুলের কাব্যে যে-সাবলীল বেগের কথা বলা হয়ে থাকে, সেটি আমাদের শিল্প-চৈতন্যে নতুন কাব্যবোধের জন্ম দিক, জন্ম দিক নতুন-নতুন সমালোচনার রীতি-পদ্ধতিরও । কথা আপাতত এটুকুনই।

## সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি

অরুণকুমার বসু, ২০১৭ (প্রপ্র. ২০০০)। *নজরুল-জীবনী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, ১৯৮৭। *নজরুল ইসলাম: কালজ কালোত্তরে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, মার্চ ২০১৬। *আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি*: চতুর্থ খণ্ড, অনু হোসেন সংকলিত ও সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, জুন ২০১৬। *আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি*: পঞ্চম খণ্ড, অনু হোসেন

সংকলিত ও সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবু সয়ীদ আইয়ুব, ২০২২। *রচনাসংগ্রহ*, পূষন আইয়ুব ও চম্পাকলি আইয়ুব সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

কাজী আবদুল ওদুদ, ১৯৮৩ (প্রপ্র. ১৯৫১)। *শাশ্বত বঙ্গ*, ব্রাক, ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম, ২০০৬। *নজরুল-রচনাবলী* (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ), সম্পাদনা-পরিষদ: রফিকুল ইসলাম গয়রহ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম, ২০১৬ (প্রপ্র. ১৯৯৭)। *প্রবন্ধ-সমগ্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

গোলাম মোস্তফা, ১৯৬২। *আমার চিন্তাধারা*, পরিবেশক: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮। *প্রবন্ধ-সংকলন*, মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ, ২০০৯। *সমগ্র প্রবন্ধ*, ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত, প্রতিক্ষণ, কলকাতা।

বদরুদ্দীন উমর, ২০০৮ (প্রপ্র. ১৯৬৮)। *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু, ১৯৮৪ (প্রপ্র. ১৯৪৬)। *কালের পুতুল*, নিউএজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ১৩৬১। *সাহিত্যচর্চা*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

মণীন্দ্র গুপ্ত, ২০২১ (প্রপ্র. ২০০৩)। *জনমানুষ ও বনমানুষ*, কিশলয় প্রকাশন, কলকাতা।

মাও সে-তুঙ, ১৯৭৯। *রচনাবলী: নির্বাচিত পাঠ*, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং।

মীনাক্ষী দত্ত, ১৩৯৫। *বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা*, সংকলন: ২, প্যাপিরাস, কলকাতা।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০১৫ (১৯৮৩)। *সমকালে নজরুল ইসলাম*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

মোহিতলাল মজুমদার, ১৯৬৯। *মোহিতলালের পত্রগুছ*, আজহারউদ্দীন খান ও ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ।

মোহিতলাল মজুমদার, ২০০৬ (প্রপ্র. ১৩৫৪)। *সাহিত্য-বিচার*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

সুকুমার সেন, ২০১০ (প্রথম আনন্দ সংস্করণ: ১৯৯৯)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*: পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৯৮৫। *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন, ২০২২। *উত্তরাধিকার*, বর্ষ ৪৫, সংখ্যা ১৩, মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯২। *আধার ও আধেয়*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ, ২০১১। *আমার অবিশ্বাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Buddhadeva Bose, 1982 (1948). *An Acre of Green Grass*, Papyras, Calcutta.

C. Day Lewis, 1957. *The Poet's Way of Knowledge*, Cambridge University Press, Cambridge.

Johann Peter Eckermann, 1951 (1946). *Conversations with Goethe*, Everyman's Library, London.

Sushil Kumar De, 1962 (1919). *Bengali Literature in the Nineteenth Century (1757-1857),* Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta.